## ষষ্ঠ অধ্যায়

# আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসা-কথার নবনির্মাণ

ব্যাধ কর্তৃক মিলনরত ক্রৌঞ্চযুগলের একটির তীর নিক্ষেপে মৃত্যু হলে বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়ের আর্তি থেকে আদি কবি বাল্মীকির মনে যে শ্লোক উত্থিত হয়, সেই থেকেই জন্ম হয় কবিতার। এরপর প্রাচীন যুগের চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, নাথসাহিত্য, কবিগান, আখড়াই, হাব-আখড়াই সবই আমরা কাব্যের আকারে লিখিত পাই। ধীরে ধীরে ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা হয়। দেববাদ থেকে মানবতাবাদ, কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তব জগৎ, অলৌকিকতা থেকে লৌকিকতা ইত্যাদি ভাবনার দিকে অগ্রসর হন কবি-সাহিত্যিকগণ। আসলে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে পরিচয়লাভের ফলে শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতায় আসে আমূল পরিবর্তন। বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ জাগতে শুরু করল মানুষের মনে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। এই অনুভূতিগুলি পৌরাণিক আখ্যানের মোড়কে প্রকাশ পেতে থাকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিত্বের হাতে। অন্যদিকে বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু প্রভৃতির হাতে এই অনুভূতিগুলি গীতিবকিতার আকারে প্রকাশ পায়। এরপরে বিশ শতকের সূচনা থেকে শুরু হয় রবীন্দ্রযুগ। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রানুসারী ও রবীন্দ্রবিরোধী কবিগোষ্ঠী যথা— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জসীমউদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি রোম্যান্টিকতা কল্পনাকে আশ্রয় করে যেমন কবিতা রচনা করেছেন। তেমনি বাস্তব জগৎ তথা তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিকগুলি তাদের কবিতায় উঠে এসেছে। বাংলা কবিতা আরো পূর্ণতার স্তরে পৌঁছায় পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর ও আশির দশকে এবং আজকের একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে আছে। আধুনিক জটিল পরিস্থিতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক পালাবদল এবং কূটিল চক্রান্ত ভাবিয়ে তুলেছে প্রত্যেক কবি ব্যক্তিত্বকে। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, জিয়া হায়দার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,

কৃষ্ণা বসু, মল্লিকা সেনগুপ্ত, জয় গোস্বামী, তসলিমা নাসরিন প্রভৃতি নবীন কবিদের হাতে বাংলা কবিতা অন্য মাত্রা লাভ করে। ক্রমে ক্রমে বাংলা কবিতা আধুনিকতার পর্ব ছাড়িয়ে উত্তর-আধুনিক পর্বে গিয়ে পৌঁছায়। নবীন প্রজন্মের বেশ কিছু কবি মানবিক, দৈহিক ও শারীরিক ক্ষুধার কথা সমৃদ্ধ হ্যাংরি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার প্রতিক্রিয়া কবিতার মধ্যে দেখা যায়। এইভাবে আধুনিক ও উত্তর আধুনিক কাল-পর্বে বাংলা কবিতা হয়ে ওঠে বিচিত্র পথগামী। বাংলার এই কাব্যজগতে দেখা যায় কিছু কবি বর্তমানের যুগযন্ত্রণা, হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি সমস্যা ও তা থেকে উদ্ধারের জন্য হাত বাড়িয়েছেন অতীত ঐতিহ্যের দিকে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী কাব্য প্রভৃতি কাব্যের অনুষঙ্গ নিয়ে বা অনেক সময় চরিত্রের আদর্শ নিয়ে রচনা করেন নতুন নতুন সৃষ্টি। মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে আধুনিককালে রচিত হয়েছে অনেক কাব্যকবিতা। আর আধুনিক যুগের সংকটময় পরিস্থিতিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এক একটি কবিতা হয়ে উঠেছে মনসাকাব্যের নবনির্মাণ। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আলোচনায় নিয়েছি কালিদাস রায়ের— ১. 'চাঁদ সদাগর' কবিতাটি। এরপরে ক্রমানুসারে ২. জীবনানন্দ দাশের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' ৩. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুত্তীর্ণ কাব্যের 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ' এবং ৪. 'লখিন্দর' কাব্যের 'বেহুলা' কবিতা। ৫. বিষ্ণু দে'র 'এবং লখিন্দর' ৬. জিয়া হায়দারের 'কৌটোর ইচ্ছেগুলো' কাব্যের 'লখিন্দর', 'বেহুলা', 'সনকা', 'চাঁদ সদাগর' ও 'মনসা', ৭. সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বেহুলা' , ৮. অরুণ মিত্রের 'ও বেহুলা', ৯. শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি', ১০. শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'মনসামঙ্গল', ১১. উত্তম দাশের 'একালের মঙ্গলকাব্য' কাব্যগ্রন্থের আটটি কবিতা, ১২. দীপঙ্কর মাহমুদের 'বেহুলার ভেলা', ১৩. জয় গোস্বামীর 'ডিঙা', ১৪. কৃষ্ণা বসুর 'চাঁদ বণিকের ডিঙা' কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ে করা হল।

আধুনিক বাংলা কবিতার বিশিষ্ট কবি **কালিদাস রায়ের** (১৮৮৯-১৯৭৫) স্কুলের গণ্ডী উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর রচিত 'কুন্দ' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁহার 'কিশলয়' (১৯১১), 'বল্লরী' (১৯১৯), 'পর্ণপুট, প্রথম' (১৯১৪), 'পর্ণপুট, দ্বিতীয়' (১৯২১), 'ব্রজবেণু' (১৯১৫), 'ঋতুমঙ্গল' (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রানুসারী এই কবি তৎকালীন কবি সমাজে নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের জন্য এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'বৈকালী' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ **'চাঁদ সদাগর'** কবিতাটিতে তৎকালীন সময় ও পুরাণের মেলবন্ধন ঘটেছে। কবিতায় বিশ শতকের বিপন্ন সময়ে মনসামঙ্গল কাব্যের মূল চরিত্র চাঁদ সদাগরকে দাঁড় করিয়েছেন পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক হিসেবে। আর এইভাবে কবি কালিদাস রায় অত্যন্ত সচেতনভাবে

মনসাপুরাণের কথাকে নিয়ে এসেছে আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে। বিশ শতকের চারের দশকে ব্যক্তিত্ব যখন অরাজকতা, অবক্ষয় ও অস্থিরতার সামনে পদানত তখন কবির কাছে উদাহরণ হয়েছে অতীতের আদর্শবাহী প্রতীক চরিত্র। বর্তমান সংকটময়, অস্থিরতাময় সময়ের অন্তরালে সন্ধান করেছেন উজ্জ্বল অতীতে। বর্তমান সময়কে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন। উক্ত কবিতায় কবি চাঁদের মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্বের আহ্বান করেছেন সমকালের দিকে তাকিয়ে। তাই কবির মুখে শোনা যায়—

‘ দেবতা মন্দিরে ভরা  সিন্দূর চন্দনে গড়া
বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি,’[১]

পৃথিবী ব্যাপী অস্থিরতা, যুদ্ধ, অরাজকতা, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, মানবতার অপমান ও লাঞ্ছনা যখন সমাজকে বিধ্বস্ত করেছে, তখন চাঁদ সদাগরের মতো ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন।

কবি মনসামঙ্গলের অন্যতম বলিষ্ঠ চরিত্র চন্দ্রধর সাধুর বন্দনা করে তাকে দেবতার উপরের আসনে বসিয়েছেন। এই যুগের পূজার অর্ঘ্য অর্থাৎ এই যুগের অন্ধকারময় সময়ে সত্যের হাল ধরতে আহ্বান জানান। এই বঙ্গভূমির সমতলে, তৃণ-লতা-গুল্মদলের মাঝে চাঁদ হল বজ্রজয়ী বনস্পতি। সত্যের পূজারী ও জ্ঞানের অধিকারী এই শালপাংশু মহাভুজ রথী সর্পদেবী মনসার দর্পকে জয় করেছেন। হেতালের লাঠি নিয়ে সাঁতালি পর্বতের উপরে মনসার কুটিলতাকে, হিংস্রতাকে বাধা দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, দৃপ্ত দীপ্তি পৌরুষ যুক্ত এই ব্যক্তি। এই সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির চারপাশে তাকে ঘিরে রয়েছে কোটি কোটি ভীরু অমানুষের দল, যারা শুধু ভয়ে কাঁপে। তাদের ভয়ের মধ্য দিয়েই জীবন মরণ। মেরুদণ্ডহীন মানুষজন অরাজকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু প্রাণেরও অধিক পণ করে, মাথার উপরে যমদণ্ডকে ভেঙে সাতখণ্ড করতে সক্ষম এই পুরুষ। প্রাণকে পণ করে সাতপুত্রের মৃত্যুর পরেও শিবের সাধনায় নিজেকে বামাচারী কাপালিকে পরিণত করে। পুত্রহারা মাতা সনকার আর্তনাদ ও কান্নার সুরে ভরে যায় চম্পক নগরের মাঠ-ঘাট। সাতপুত্রসহ চৌদ্দ ডিঙা মধুকর এবং ধনজন সর্বস্ব হারিয়েও চাঁদের চোখে জল নেই। এই দুর্বিষহ মহাশোকের ফলে চোখ দিয়ে শুধু প্রতিশোধের আগুন বিচ্ছুরিত হয়েছে। নিঃস্ব হয়েও চাঁদ পথে পথে ফিরলেও নিজের পৌরুষত্বে অটল। দেবাদিদেব মহাদেব শুধু কণ্ঠে বিষ ধারণ করেছিলেন কিন্তু চাঁদ সদাগরের সর্বঅঙ্গে গরল—

‘বিষে তনু নীলরুচি  আত্মা তব শুভ্র শুচি
নীলম্বরে পূর্ণচন্দ্রোপম,

সহস্র ফণার মাঝে তোমার পৌরুষ রাজ
নাগবৈরী বৈনতেয় সম।”[২]

এই বিষে গোটা দেহ নীলাবর্ণ তবুও আত্মা শুভ্র শুচি সম্পন্ন। নীল বসনের পূর্ণ চন্দ্রের মতো বিরাজমান এই চাঁদ। তাঁর সত্যাদর্শ, ক্রমজ্ঞান ও তেজস্বী ব্যক্তিত্বের কাছে সহস্র ফণাও হার মেনেছে। এই সহস্র ফণার মাঝে নাগবৈরী বৈনতেয়র মতো তাঁর পৌরুষ বিরাজ করে। বাহ্যিক ধনসম্পত্তি হরণ করেও তাকে কেউ নিঃস্ব করতে পারবে না, এমন স্পর্ধাও কারো নেই। পুরুষার্থ যার শিরোমণি, শাশ্বত ধনে যিনি ধনী, সারা বিশ্বে তাই এই ব্যক্তিত্ব নমস্যের যোগ্য। এই চাঁদ সদাগরকে বিভিন্নভাবে ফাঁদে ফেলার যে সমস্ত ফন্দী সবই ব্যর্থ হয়েছে। শেষে চাঁদকে শায়েস্তা করার জন্য দেবতাকে মানুষের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়। সমস্ত হিংসা, শাস্তি, ভয় যিনি জয় করেছেন, দণ্ডদাতা তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সারা বিশ্ব যেখানে ভীরুতার সহিত অসহায়ের মতো নিয়তির কাছে সবকিছু সমর্পণ করে তার জয়গান গায়। সাধারণ মানুষ দাসত্বের কাছে মাথা নুইয়ে দেয়, কিন্তু চাঁদ একই প্রতিরোধের ধ্বনি তুলে দম্ভিত দেবতাকে হতচকিত করে তোলে। দেবতার পাষাণ মন্দিরও কেঁপে ওঠে এই শৌর্যের দীপ্তিতে। যুগ যুগ ধরে যে মেরুদণ্ডহীন ভীরু মানবের জাতি দেবতার বাণী ও দণ্ড অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছে। কবির বক্তব্য তারা কি আজ চাঁদ সদাগরের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রুদ্রকণ্ঠে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সহস্র বছর ধরে যুপবদ্ধ ছাগের মতো যে নরনারী ভয়ে থরথর কেঁপেছিল, তাঁদেরই মাঝে চাঁদ বজ্রের মতো কণ্ঠস্বরে দেবরাজের কাছে প্রস্তাব রাখে মানুষেরও যজ্ঞভাগ চাই বলে। এই চাঁদ মনসার কাছে মাথা নত করেনি, বরং মনসাকেই তাঁর কাছে মাথা নত করিয়েছে। সমগ্র মানব সমাজকে এই বাণী শেখালেন যে দেবতার চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কবির ভাষায় এটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

‘‘শিখাইলে এই সত্য তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব
দেব নয়, মানুষই অমর।
মানুষই দেবতা গড়ে তাহারই কৃপার পরে
করে দেব-মহিমা নির্ভর।”[৩]

মানুষের এই শ্রেষ্ঠতার কারণেই ব্রহ্ম সত্যকে ছোট করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ভোগ বিলাসী হতে পারেনি এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী। মৃত্যুর শাসনকে জয় করেছিল চিদমৃত পান করে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের অতীত এই অটল ব্যক্তিত্ব। ‘উদ্যত-কনকঘট’ এবং ‘সহস্র দেউল মঠ’ কাল দণ্ডে গুঁড়া হয়ে গেলেও, গরল সিন্ধুর মাঝে চাঁদ সদাগরের শৌর্য চিরদিন দণ্ডায়মান থাকবে মৈনাকের

চূড়ার মতো।

চাঁদসদাগরকে কবি আহ্বান করেছেন বিশ শতকের মুক্তিকামী মানসিকতা নিয়ে। এই 'চাঁদ সদাগর' কবিতায় দৈবশক্তি যেন অশুভ শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। সেই অশুভ দৈবশক্তির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ নয়, সমস্ত অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বজ্রকঠোর মনোভাব প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। মানুষ নিজের কল্পনায় যে দেবতার সৃষ্টি করেছে, সেই দেবতা কখনোই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। একশ্রেণীর সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য মনের মতো দেবকল্পনা করে মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করে সংকুচিত করেছে। কিন্তু কবি কালিদাস রায় বিশ শতকের তিন চার দশকে পুরাণের চাঁদ সদাগরকে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে সমকালের আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সম্পর্কে সমালোচক সনৎকুমার নস্করের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ''বস্তুতপক্ষে এ কবিতায় সমকালের বাঙালি সমাজের মধ্যে কবি যে নীচতা, ক্ষুদ্রতা, নিয়তি নির্ভরতা, আদর্শহীনতা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সব ক্লিন্নতার পাশে চাঁদের হিমালয় সদৃশ ব্যক্তিত্বকে স্থাপন করে এই উন্নত শির মানুষটির চরিত্র গৌরব আরও, উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন।''[৪]

'ত্রিপদী' ছন্দে রচিত 'ওড' শ্রেণীর এই 'চাঁদ সদাগর' কবিতায় কবি বর্তমান যুগের মানুষকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। আগামী প্রজন্মকে মানবতার মাহাত্ম্যের বাণী শুনিয়েছেন। আর এই সত্যকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অবলম্বন করেছেন মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের সেই প্রসিদ্ধ চরিত্র চাঁদ সদাগরকে। অসহায় মানুষ যে নিয়তির কাছে সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে ক্ষমতার সামনে নুইয়ে দিয়েছে দাসত্বের মাথা; এই দাসত্বের ভার নিয়ে মানুষ যুগ যুগ ধরে চলেছে। প্রাচীনকালে সব ছিল দেবদেবীর শক্তি নির্ভর, বর্তমানে তা রূপান্তরিত হয়েছে ক্ষমতায়। মানবতা, ব্যক্তিত্ব, সত্য, আদর্শ সবকিছু এর চাপাকলে কণ্ঠরুদ্ধ। আর এই সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আদর্শ মানব হিসেবে চাঁদ সদাগরকেই কবি বেছে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারের 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ' গ্রন্থের মন্তব্যটি উক্ত স্থানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ''অরণ্যের কৃপা গ্রহণের মধ্যে মানুষের মহিমা নেই, মহিমা তার সংগ্রামের, প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে নিজেকে সৃষ্টি করার মধ্যে। তাই যদিও চাঁদের পরাজয় একটা নিশ্চিত সত্য, তথাপি পদ্মার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম মহিমাময়; কারণ অনাত্মীয় পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ প্রকাশ

করতে চাইছে নিজেকে। ... মানুষ চাঁদ মহিমায় দীপ্তিমান, কেননা তার সৃষ্টি দেবতা অসভ্যতার ধোঁয়ায় ম্লান।"[৫]

আর এই চাঁদ সদাগরকেই কবি আহ্বান জানিয়েছেন বর্তমানের সংকটময় মুহূর্তের কাণ্ডারী হিসেবে।

এই কবিতা নামকরণেই কবির প্রাচীনের প্রতি প্রেরণা অনুভব করা যায়। তিনি প্রাচীন বাংলা ও পল্লীবাংলার কাব্যসমৃদ্ধিকে এক নতুন ভঙ্গিতে, নতুন সুরে ও নতুন ভাষায় পরিপুষ্ট করেছেন। কবি পুরাণের ঘটনার আবরণে সমকালীন পৃথিবীর অবক্ষয় ও তার মুক্তির উপায় তুলে ধরেছেন। তাই বর্তমান পৃথিবীর চরম অবনতির প্রেক্ষাপটে তার আদর্শকে আহ্বান করেছেন। আর এই প্রসঙ্গে কবি চাঁদ সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'বনস্পতি', 'মহাভুজ রথী', 'কাপালিক' ইত্যাদি যুক্ত ভাষার মাধ্যমে মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্র পেয়েছে বৃহত্তর কালিক ব্যাপ্তি ও ব্যক্তিক ব্যঞ্জনা। কবি চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বকে বিশ শতকের চারের দশকের শোষক ও শোষিতের লড়াই-এর মাধ্যমে নবরূপ দান করেছেন। মনসার অত্যাচার পরিণত হয়েছে অসহিষ্ণু অমানবিক লাঞ্ছনাকারী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থায়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শক্তি রূপে চাঁদ চরিত্র পরিণত হয়েছে বর্তমানের সৈনিক রূপে। এই দিক থেকে 'চাঁদ সদাগর' কবিতাটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ চরিত্রের আধুনিক রূপায়ণ।

বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কবি **জীবনানন্দ দাশ** (১৮৯৯-১৯৫৪), তাঁর **'রূপসী বাংলা'** কাব্যের **'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'** কবিতায় বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন সেই মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের পরিমণ্ডলে। কবিতাটিতে কবির নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার পূর্বে আমাদের কবি সম্পর্কে দু'চার কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন ঘটেছে। তিনি সুররিয়ালিস্টিক দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে অনুভব করতে চাইলেও তাঁর কবিতায় মিথ ও লোকপুরাণ প্রত্নপ্রতিমা হয়ে ওঠে। বাংলার সুপ্রাচীন পলিমাটির স্তরে স্তরে চাপা পড়ে আছে যে পুরনো কাহিনি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কবি 'রূপসী বাংলা' কাব্যে বাংলার সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যশালী সম্পদ তুলে ধরতে গিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের জগতে ফিরে গিয়েছেন বারেবারে। আলোচনার সূত্রে তাঁর প্রধান কাব্যগুলি, যথা—

১. 'ঝরাপলক' —১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ

২. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' — ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ

৩. ‘বনলতা সেন’ — ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ

৪. ‘মহাপৃথিবী’ — ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

৫. ‘সাতটি তারার তিমির’— ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ

৬. ‘বেলা অবেলা কালবেলা’— ইত্যাদির নাম উল্লেখ করতে পারি ।

কবি জীবনানন্দ দাশ ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ সনেটধর্মী কবিতাটিতে গ্রামবাংলার প্রকৃতি রূপের মধ্যে যে অফুরন্ত সৌন্দর্য রয়েছে তাকে বর্ণনা করেছেন নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে। কবি প্রথমেই ঘোষণা করেছেন যে—

‘‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব’সে আছে
ভোরের দয়েল পাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের- হিজলের-অশথের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাতের ছায়া পড়িয়াছে;’’[৬]

কবি বাংলার সৌন্দর্য দেখেছেন, অনুভব করেছেন, তাই পৃথিবীর রূপ দেখার প্রয়োজন নেই তাঁর।

কবি এই পল্লবের স্তূপের মধ্যে মানবীয় রূপ প্রদান করেছেন। তারা যেন চুপ করে আছে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে। ফণীমনসার ঝোপ ও শটিবনের মধ্যে এই পল্লবের স্তূপের ছায়া পড়েছে। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে ফণীমনসা ও শটিবনের মধ্যে লোকপুরাণ মনসামঙ্গলের দেবী মনসার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। এর পরে পরেই তিনি পেয়েছেন মধুকর ডিঙা, চাঁদ সদাগর, চম্পা প্রভৃতি অনুষঙ্গগুলি। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের চম্পক নগরের বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগর দেবী মনসার প্রকোপে ছয়পুত্র হারিয়ে দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যায় চৌদ্দডিঙা মধুকর (মতান্তরে সপ্তডিঙ্গা মধুকর) নিয়ে। নানারকম দ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য যাত্রাকালে এরকম হিজল, বট, তমালের নীল ছায়াযুক্ত বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল। ডুমুর গাছের ছায়ার মতো পাতার নীচে ভোরের দোয়েল ও শান্ত স্নিগ্ধ বাংলা তাকে অতীতেই দেখেছিল চাঁদ বণিক। তাই কবির ভাষায় উঠে এসেছে —

‘‘মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমন হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিলো।’’[৭]

আবার বলা যায়, চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা মনসার আশির্বাদে পুত্রবর লাভ করে এবং তার

নাম রাখে লখীন্দর। উজানী নগরের কন্যা বেহুলার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তবে মনসার চক্রান্তে বাসররাতে প্রাণ হারায় লখীন্দর। এই মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে যায় বেহুলা স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য। তাই— শুধু চাঁদ সদাগর নয়, বেহুলাও মৃত স্বামীকে নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভেলা নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় বাংলার এই অপরূপ রূপ দেখেছিল। তার সেই দুর্ভাগ্যের দিনে কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন নদীর চড়ায় মারা যায় সেই সময়ও সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য শান্ত নিবিড় অশ্বত্থ বট গাছ দেখেছিল, শ্যামার নরম গান শুনেছিল। এখানে কবি সবুজ প্রকৃতি ও সমৃদ্ধতর বাংলার রূপময়তাকে আরো পূর্ণ করে তোলেন 'শ্যামা' পাখির নরম গানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।

মনসামঙ্গলের বেহুলা মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য নেতা ধোপানীর সাহায্যে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে ইন্দ্রের সভায় গিয়ে লাস্যনৃত্যের মাধ্যমে দেবতাকূলের মন জয় করে স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলে। তবে এর আড়ালে থেকে যায় নারীর অন্তরের বেদনা। তাই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ এই কবিতায় বলেছেন—

> ''ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
> বাংলার নদীমাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মত তার কেঁদেছিল পায়।।''[৮]

এই নৃত্যের প্রসঙ্গ তুলে নারী জাতির অপমান ও লাঞ্ছনার কথা বলেন কবি। নারীর এই অসম্মান ও অসহায়তায় বাংলার নদী, মাঠ, ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো কেঁদেছিল তার পায়ে। মধ্যযুগের নারীর অসহায় বিপন্ন অবস্থার পুরাণ কাহিনীকে বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে একাকার করেছেন।

বিশ শতকের মধ্যভাগের সময়ে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, হত্যা, খুন, অসহায়তা, মূল্যবোধহীনতা প্রভৃতি ঘটনায় মানুষ যখন জর্জরিত, সেই সময় প্রকৃতির মধ্যে শান্তনিবিড় আশ্রয় খুঁজেছেন কবি। সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যেও এই প্রকৃতির রূপময়তা, সৌন্দর্যময়তার চিত্র তুলে ধরেছেন, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। অগণিত কাল ধরে প্রবাহিত এই সমৃদ্ধিকে নির্দিষ্ট শতক দিয়ে মাপা সম্ভব হয় না। ফণীমনসা, মধুকর ডিঙা, চাঁদ, চম্পা, বেহুলা ইত্যাদি মনসামঙ্গলের প্রসঙ্গ তুলে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তেমনি প্রকৃতির সৌন্দর্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বেদনাতুর হৃদয়ের কথা তুলে ধরেছেন। তাই বলা যায়, বর্তমানে আধুনিক যুগের দাঁড়িয়ে কবি মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়কে কাব্যে স্থান দিয়ে তাকে নতুন মাত্রা দান করেছেন। এক নতুন অভিব্যক্তিতে উঠে এসেছে মনসামঙ্গলের সেই আবহ। প্রকৃতির মধ্যে তাঁর সমবেদনার অনুভব তুলে ধরেছেন কবি, তাতে মনসামঙ্গল কাব্য এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সমালোচক

প্রভাতকুমার ভট্টাচায় 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন সেখানে কবির আরো কিছু অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে—

> ''বিশ শতকের ভগ্ন সময়ে যখন যুদ্ধ মন্বন্তর দাঙ্গা হত্যা খুন ও ধ্বংসে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে মানুষের পৃথিবী; তখনকার রূপময়ী, লাবণ্যময়ী প্রকৃতিও যেন আবহমান কাল ধরে চলে আসা প্রকৃতির মতোই। পুরাণের যুগের মতোই সে সাজিয়েছে গাঙুড়ের ঢেউ, হিজল বট তমালের অপরূপ রূপ। তাহলে মানুষের পৃথিবীকে কলুষিত করেছে কে? এই জিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই চিরন্তন এক প্রশ্ন তৈরী হয়। আবহমান কাল ধরে চলে আসা বাংলার প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় থাকলেও মানুষের লোভ ও স্বার্থই কী কবি-হৃদয়কে নিরাশ্রয় করতে চেয়েছে?''[৯]

বেহুলার ঘুঙুরের কান্নার মধ্য দিয়ে রূপসী বাংলার বিপন্নতা ও অসহায়তা চিহ্নিত হয়েছে কবিতার শেষোক্ত পংক্তি দুটির মধ্য দিয়ে। মনসামঙ্গলের 'মিথ'কে বাংলার প্রকৃতি রূপের মধ্যে স্থাপন করে এক অপূর্ব শিল্প নির্মাণ করেন। বেহুলার অমরায় গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনের মতো ঘটনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কালো দিকটি চিহ্নিত হয়েছে। এখানে নারীর অসহায়তা, বিপন্নতা ও লাঞ্ছনার অন্তহীন আঘাত বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছে। প্রচলিত এই মনসাপুরাণের মিথের মধ্যে বিশ শতকের বিপন্ন সময় নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে।

'রূপসী বাংলা' কাব্যের 'হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে নাকি' কবিতায় আমরা মনসামঙ্গলের পরিচয় পাই। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী মনসার চক্রান্তে কালীদহের গভীর জলে নিমজ্জিত হয়। সেই সময় আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন দু'প্রহরের সেই পাখির কলরবের দ্বারা বাংলায় এই কালীদহের শূন্যতা ও স্তব্ধতা ভেঙে দিয়েছিল। কবি প্রকৃতির রূপের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মুগ্ধতার মধ্য দিয়েই অতীতচারী হয়ে উঠেছেন। বাদল ও মেঘের ছায়া দেখে চাঁদ সদাগর ও মধুকরডিঙার কথা কবির মনে হয়েছে—

> ''চাঁদ সদাগর: তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে,
> কালীদহে কবে তারা পড়েছিল একদিন ঝড়ের আকাশে,
> ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে নাকি?
> সনকার মুখ আমি দেখি না কি?''[১০]

কবি আজকের 'বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়া', 'ধলেশ্বরীর চড়ায়' ও 'গাংশালিকের ডাকে'র

অনুসঙ্গের সমান্তরালে মনসামঙ্গলের কালীদহ, অজানা পাখি ও চাঁদের মধুকরডিঙার কথা স্মরণে আসে। এইভাবে আমরা দেখি আধুনিক কবিতার মধ্যে মনসামঙ্গলের কথাকে নতুনভাবে রূপায়ণ করেছেন। 'রূপসী বাংলা' কাব্যের কবিতাগুলি সম্পর্কে সমালোচক বিপ্লব চক্রবর্তী যা মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে খুবই প্রযোজ্য—

> ''এই কবিতাগুলোয় কান পাতলে বাংলার লোক-জীবনের নানা কথায়
> বাংলার ইতিহাস ভূগোল বা পুরাণের স্রোত বেয়ে ভেসে আসা লোক-
> জীবনের বিচিত্র উপাদানের ঐক্যতান শোনা যায়।''[১১]

পরিশেষে বলা যায় কবি জীবনানন্দ দাশ বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে মনসা-কথার অনুষঙ্গকে নিয়ে এসে বর্তমান যুগের মূল্যায়ন ঘটিয়েছেন। যার ফলে কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে একট একটি নতুন সৃষ্টি।

আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম কবি **বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের** (১৯২০-১৯৮৫) মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যকে অনুসরণ করে রচিত কয়েকটি কবিতা আমরা পেয়ে থাকি। 'মৃত্যুত্তীর্ণ' (১৩৬২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত '**বেহুলা নাচানো স্বর্গ**', 'লখিন্দর' (১৩৬৩) কাব্যের '**বেহুলা**' কবিতা এবং 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' (১৩৭১) কাব্যের '**বেহুলা**' নামক কবিতা প্রভৃতি। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও অস্থিরতার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাস্তববাদী কবি হিসেবে তিনি জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেন। মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশার কারণ হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন প্রচলিত সমাজকেই। আবার সমকালের বিপন্ন রুগ্ন সমাজকে অনুভব করতেই অতীতকে অনেক সময় অন্বেষণ করেছেন। স্বার্থপর মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় যে অমানবিকতা ও নিষ্ঠুরতাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি ক্ষোভে ও যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন। তবে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে মুগ্ধ হয়ে তাদের মধ্যেই আস্থা ও বিশ্বাস খুঁজে পেতে চেয়েছেন। জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতায় যেমন বাস্তব জীবনের বৈপ্লবিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন, তেমনি জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

১. 'বানুর জন্য' (১৯৫১খ্রী:)

২. 'লখিন্দর' (১৯৫৩ খ্রী:)

৩. 'উলুখড়ের কবিতা' (১৯৫৪ খ্রী:)

৪. 'মৃত্যুত্তীর্ণ' (১৯৫৫ খ্রী:)

৫. 'জাতক' (১৯৫৮ খ্রী:)

৬. 'তিনপাহাড়ের স্বপ্ন' (১৯৬৩ খ্রী:)

৭. 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে' (১৯৭২ খ্রী:)

৮. 'রাস্তায় কে হেঁটে যায়' (১৯৭২ খ্রী:)

৯. 'মানুষ খেকো বাঘেরা বড় লাফায়' (১৯৭৩ খ্রী:)

১০. 'পৃথিবী ঘুরছে' (১৯৭৫ খ্রী:)

১১. 'বেঁচে থাকার কবিতা' (১৯৭৭ খ্রী:)

১২. 'নীলকমল-লালকমল' (১৯৭৮ খ্রী:)

১৩. 'এই হাওয়া' (১৯৮২ খ্রী:)

১৪. 'অথচ ভারতবর্ষ তাদের' (১৯৮৫ খ্রী:)

১৫. 'অফুরন্ত জীবনের মিছিল' (১৯৮৫ খ্রী:)

১৬. 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' (১৩৭১ খ্রী:) প্রভৃতি।

তাঁর কাব্যে সমকালের সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও স্বার্থশীল মানুষের অহমিকা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তারই সঙ্গে অতীত তথা ইতিহাস বা মিথ অনেক সময় দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করেছে তাঁর বৃহত্তর কাব্যজগতে। অনেক সময় অতীতের ঐতিহ্যকে তুলে এনে বর্তমানে কলুষিত জগৎ থেকে নিস্তারের পথ খুঁজেছেন। আর এই পথ ধরেই তাঁর কবিতায় প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা বিষয় পুনর্নির্মিত হয়েছে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে নিজেই আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন—

> ''মানুষ কোনো ঈশ্বরপ্রেমিক বৃক্ষ নয়, সারা জীবন ধরে তাকে রাস্তার পর রাস্তা হাঁটতে হয়। ...প্রেমের গান গাইতে গাইতে হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠে আসে ... এর পরেও কি তোমার কিছু কথা আছে? জীবনকে নতুন করে দেখার আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। কেননা, সমস্ত ব্যাপারটাই অনুভব করার। অনুভব কোনো প্রশ্নের উত্তর নয়। সময়, স্বদেশ, মনুষ্যত্ব কবি, কবিতা, কবিতার পাঠক কোথাও যদি এক সূত্রে বাঁধা যেতো? হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত।''[১২]

৩২টি চরণে রচিত কবির 'মৃত্যুত্তীর্ণ' (১৩৬২) কাব্যের অন্তর্গত 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ' কবিতাটিতে মনসামঙ্গলের বেহুলার স্বর্গের নৃত্যের চিত্রটি নতুনভাবে চিত্রিত করেছেন লেখক। যার ফলে কবিতাটি হয়ে উঠেছে ভিন্ন এক স্বাদের কবিতা। আমাদের পরিচিত মনসামঙ্গলের কাহিনিতে বেহুলার স্বর্গে নৃত্যের দৃশ্য আমাদের সকলেরই পরিচিত। দেবী মনসার কোপে সাওঁতালি পর্বতের উপরে অবস্থিত লোহার বাসরে স্বামী লখীন্দরকে কালসাপে দংশন করে। বেহুলা স্বামীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে কলার মান্দাসে করে মৃতদেহ নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভেসে যায়; পরে নেতা ধোপানীর সহায়তায় স্বর্গে উপস্থিত হয়। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের সম্মুখে লাস্যনৃত্য করে লখীন্দরের প্রাণ ভিক্ষা কামনা করে। এই নৃত্যের মাধ্যমে বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে এবং শর্ত হিসেবে চাঁদ সদাগর বাম হস্তে মনসার পূজা দিতে বাধ্য হয়। মনসামঙ্গলের কাহিনীতে বহু প্রচলিত চরিত্র বেহুলাকে সতীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়— বেহুলা বাঙালী নারীর চিরন্তন সহনশীলতার স্বরূপ নয়, বেহুলা এখানে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে মুখরা। নিয়তিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি অর্জন করেছে সে। কবিতাটি শুরু হয়েছে ইন্দ্রের সভাগৃহের বেহুলার নৃত্যের দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। কবি প্রথমেই বেহুলাকে প্রশ্ন করেছে—

''অয়ি পদ্ম পলাশলোচনা
তোর চোখে কি পড়লো ধুলো?
যেন নীলাকাশ জুড়ে লাল চোখ
আর মেঘে ঝড় এলো।

তোর কী হলো আজকে ললনা?
কোন কুটির ঐরাবত
দিল নীলোৎপলেও বেদনা
আহা রাঙা হলো কোকনদ।''[১৩]

নীলাকাশ জুড়ে যখন লাল মেঘে ছেয়ে যায় এবং মেঘে মেঘে ঝড় আসার চিত্রকল্পে কবি যেন বেহুলার বিদ্রোহের ঘোষণা দেখতে পান। আদিকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নারীকে পুরুষের চাহিদার যূপকাষ্ঠে বলী হতে হয়, বেহুলাও সেই শিকারে পরিণত হয়। কবিকে তাই বেদনার সহিত বলতে শোনা যায় কোন কুটির ঐরাবত এসে বেহুলার 'নীলোৎপলে' আঘাত করল, যার ফলে 'কোকনদ' রাঙা হয়ে উঠল। ভোগবাদী অগ্রাসী মেঘ ঝড় তুলেছে বেহুলার হৃদয়েও। বাইরেও এই

প্রতিবাদের ঝড় দানা বেঁধেছে। কবির ভাষায় তাই শোনা যায়—

''নাকি নিয়তির বাঁকা তলোয়ার
নীল নয়নে দিয়েছে দাগ
আঁকে ফুলে ফুলে তাজা রক্ত
তার শিলীমুখ অনুরাগ?''[১৪]

বেহুলার এই দুর্দশার জন্য নিয়তিই যেন দায়ী। এই নিয়তির বাঁকা তলোয়ার নীল নয়নে দিয়েছে দাগ। ফুলে ফুলে জমে উঠেছে তাজা রক্ত। বেহুলার এই প্রতিবাদের রক্তই গ্রীষ্মের মধ্য দুপুরে যেন ডেকে এনেছে কালবৈশাখীর অগ্নিদাহ ঝড়। এই ঝড়ের মধ্যেই আশার কথা বলেছেন। তাই পূর্বরাগের সোহাগে ভরপুর বেহুলা। গলায় পড়েছে নীলকণ্ঠের মালা। দারুণ কষ্টের মুহূর্তেও এই বেহুলা দুঃসময়কে অতিক্রম করতে চেয়েছে। তাই সে গলায় পড়েছে নীলকণ্ঠের মালা। এই তেজস্বিনী বেহুলার লাস্যনৃত্য দেখে ও রং বদলের ঘটা দেখে দেবরাজ ইন্দ্রও ভয়ে কুণ্ঠিত হন। তবুও বেহুঁশ নটিনীর লাস্যময়তা উগ্র কামনা বাসনা প্রকাশে কেঁপে ওঠে স্বর্গ। তার লজ্জাহীন এই নৃত্যে 'নখী রক্তচারী'র লোলুপতা আরো বৃদ্ধি পায়। শরীর লোভীরা অগ্রাসী মনোভাব নিয়ে জেগে উঠেছে। যৌবনের জলসায় দেবতাদের মুগ্ধ করার জন্য স্বীয়দেহ সপে দেয় বেহুলা। এই পরিস্থিতির জন্য বেহুলার উগ্রতাই পরোক্ষভাবে অভিযুক্ত করেন কবি। লজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম প্রভৃতি মানবিক বোধগুলি যখন মাটিতে মিশে যায় তখন নেমে আসে জাতির দুর্দিন। বেহুলার প্রতি তাই কবির প্রশ্ন—

''এ কি যৌন-জ্বরের জলসায়
তুই তনু দিলি অঞ্জলি—
হাসি কান্নার চান-পান্নায়
ছুঁড়ে দিলি ছেঁড়া কঞ্চুলী।''[১৫]

আসলে বেহুলার এই নৃত্যের মধ্যে রয়েছে সদ্য-বিধবা নারীর চাপা কান্না। দর্শকমণ্ডলী দেবতাদের উদ্দেশ্যে পরনের ছেড়া কাঞ্চুলী ছুড়ে দেওয়া হল শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদে দেবতামণ্ডলীও জড়সড় হয়ে পড়ে। বোবা রক্তের কোলাহলে ফেটে পড়ে স্বর্গভূমি। আগুনের মতো জ্বলে ওঠে এই 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ'। আজকের দিনেও পুরুষের অত্যাচারের

কবলে পড়ে অবলা নারী জর্জরিত। তবে আজকের বেহুলা প্রতিবাদে মুখর, অন্যায়কে সে কিছুতেই মেনে নেয় না। আধুনিক যৌনাচারের বিরুদ্ধে সে নারীর মূল্যবোধের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য প্রতিবাদ সোচ্চার হয়। আজকের বেহুলা তার নাচানো স্বর্গকে ক্রোধে আগুনের মতো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই বেহুলার নৃত্যের পরিণামের কথা কবি তুলে ধরেছেন এইভাবে—

"ও কী দেবতা অসুর জড়সড়
বোবা রক্তের কোলাহলে।
এই বেহুলা নাচানো স্বর্গ?
সে যে আগুনের মতো জ্বলে।"[১৬]

উক্ত কবিতায় আমরা দেখতে পায় বেহুলার উগ্রতায়, তেজে, ক্রোধে বেসামাল হয়ে পড়ে স্বর্গভূমি। দেবতারা চোখে ধোঁয়াশা দেখে, প্রকম্পিত হয় তাদের পৌরুষ। এখানেই যেন আজকের বেহুলার জয় ঘোষণা করেছেন কবি। অসহায় এই বাংলার নারী হাসিকান্নার চুনি-পান্নায় ছুড়ে দেয় ছেঁড়া কঞ্চুলী। বেহুলার দ্বন্দ্বময়তা, বিপন্নতা এবং হতাশাময় জীবনকে তুলে ধরতে গিয়ে উঠে এসেছে আজকের সমাজের বিধ্বস্ত সময়ে চালচিত্র। তিনি এমন এক নারীর চরিত্র নির্মাণ করেছেন, যার কাছে দেবতাও থরথর। এখানে বর্তমান সমাজের নারীচেতনাই যেন জয়লাভ করে। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা যেন নারীবাদী চেতনার প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়েছে। নারীর বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বেহুলা চরিত্রকে নতুনভাবে অঙ্কন করেছেন কবি।

তৎকালীন হতাশা, সংকট ও অবক্ষয়ের যুগে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'লখিন্দর' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বেহুলা' কবিতাটির মধ্য দিয়ে আশাবাদের কথা বলেছেন, সত্য ও সুন্দরের বাণী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লখীন্দরকে স্বদেশভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৪টি চরণের এই সনেট জাতীয় কবিতায় সংগ্রামশীল মানসিকতা নিয়ে তৎকালীন ক্লেদাক্ত সমাজকে অতিক্রম করে যাওয়ার আশা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই কাণ্ডারী হিসেবে রয়েছে বেহুলা নিজেই। মৃত লখিন্দরকে কোলে নিয়ে কলার মান্দাসে করে গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায় তাকে জীবিত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। কবিতার প্রথমেই তাই বেহুলার উক্তিতে শোনা যায়—

''সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছি রক্ত পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে। আমি কান্নার যন্ত্রণা
গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তাড়াই।''[১৭]

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের যে নৈরাজ্য, হিংস্রতা, ভীরুতা, লোভ, হিংসা রক্তপুজে মাখামাখি রাত্রি প্রভৃতি যেন ভেলায় ভাসিয়ে দেয় বেহুলা। মানুষের মধ্যে যে প্রেম, ভালোবাসা, আত্মীয়তা, আশা, স্বপ্ন, সৌন্দর্য ছিল তা হায়না, শেয়াল, শকুনের মতো অত্যাচারীর দাঁতের আঘাতে বিপর্যস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। লুব্ধ এই শিকারীর থাবা ধারালো দাঁত কশা দ্বিপ্রহরকেও ছিঁড়ে ফেলে। এই বেহুলা কান্নার যন্ত্রণা গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তাড়ায়। তবুও বাংলার এই বিধবা সতী লখীন্দরকে জীবিত করার কথা ভাবে। বাংলার এই সাবিত্রী পাতালে, নরকে অথবা মনের দুয়ারে যেখানেই এই ভেলা ভিড়বে, সেখানেই নিয়ে যাবে স্বামীর মৃতদেহ। এমনকি সমুদ্রেও শান্ত প্রতীক্ষার স্ত্রোত্র গাঁথবে পয়ারে বলে প্রতিজ্ঞা করে সে। আসলে সমকালীন দেশের দুরবস্থা, দোলাচলতা তা ধৈর্য শক্তির দ্বারা, শান্ত মস্তিস্কের মাধ্যমে দূরাভূত করার কথা ভাবে। বেহুলার মৃতস্বামী লখীন্দরকে জীবিত করার যে পরিক্রমার পথ তা নতুন রূপে উঠে এসেছে। মনসামঙ্গলের মিথের নবরূপায়ন ঘটেছে এখানে। বেহুলা কবিতায় শুধুমাত্র চাঁদসদাগরের পুত্রবধূরূপে নয়, সমগ্র দেশপ্রেমিকের রূপকল্পে উঠে এসেছে; যার হাত ধরে স্বদেশভূমি আবার পবিত্র হয়ে উঠবে। এই বেহুলা তাই অনায়াসেই বলে ওঠে—

''গান দেব, জ্বলব, কিন্তু হব না অঙ্গার;
সে জাগবে, জাগবেই, লখিন্দর সে আমার।''[১৮]

এছাড়া 'লখিন্দর' নামক এই সমগ্র কাব্যগ্রন্থে ছায়া ফেলেছে মনসাপুরাণের লখীন্দর চরিত্র সম্পর্কিত মিথ। এই চরিত্রকে নানা দিক দিয়ে অনুভব করতে গিয়ে তাকে তিনি নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছেন। এই কাব্যের 'সোনার চাঁদ ছেলে', 'ওঁরাও নৃত্যসংগীতের অনুসরণ', 'গোধূলির সাঁওতাল', 'গোধূলিযাত্রা', 'প্রভাস', 'দময়ন্তী/২', 'নচিকেতা', 'সূর্যমূখী' প্রভৃতি কবিতায় লখীন্দর সম্পর্কিত মিথ নতুনভাবে উঠে এসেছে। এইভাবে 'লখিন্দর' কাব্যগ্রন্থও হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের নব নির্মাণ। এখানেই কবির কাব্য নতুনরূপ নিয়ে সার্থকতা লাভ করেছেন।

'মুখে যদি রক্ত ওঠে' (১৩৭১) কাব্যের 'বেহুলা' নামক কবিতাটি আধুনিক প্রেম চেতনার আলোকে লেখা। এই কবিতা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি বিষ্ণু দের 'ওফেলিয়া' কবিতাটি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার লখীন্দর ও অন্যদিকে ওফেলিয়া দুজনেই নিয়তির শিকার। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব এবং লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যুর ফলে কলার মান্দাসে করে ভেসে যাওয়ায় যে তার কোন অপরাধ ছিল না। তেমনি পাশ্চাত্য নাট্যকার শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের নায়িকা ওফেলিয়াও হ্যামলেটের মাতার ব্যভিচারী পুণর্বিবাহ ও কাকা ক্লডিয়াসের কূচক্রান্তের জন্য দায়ী ছিল না। তবুও এই সমস্ত পরিস্থিতির শিকার হতে হয় লখীন্দর ও ওফেলিয়াকে। চাঁদ সদাগরের মনসার সাথে দ্বন্দ্বের কারণে শুধুমাত্র লখিন্দরকে প্রাণ হারাতে হয় না, বেহুলাকেও অকাল বৈধব্য বরণ করতে হয়। বেহুলা-লখীন্দরের প্রেমময় জীবন প্রারম্ভকালেই গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায়। সমকালীন অভিশপ্ত সমাজ ব্যবস্থায় যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করতে হয় লখীন্দর ও ওফেলিয়া। নিরাপরাধ বেহুলাকে অভিশাপ গ্রহণ করতে হয়— খণ্ড কপালিনী ও চিরুণদাতিনী ওফেলিয়া ও লখীন্দরের অপরাধহীন সত্য যন্ত্রণাকে কবি যুগযন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই যুগযন্ত্রণায় দায় বহন করতে হয় শুদ্ধচিত্ত লখিন্দর ও ওফেলিয়াকে। জলে যেমন ভাসে ওফেলিয়া, তেমনি ভাসে 'অবাক লখিন্দর'। তবুও কবি বেহুলাকে নিয়ে আশার স্বপ্ন দেখে। এখানেই কবি বেহুলা ও লখীন্দর চরিত্র নির্মাণে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছেন। আর এভাবেই পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটেছে।

রবীন্দ্র পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভার অধিকারী হলেন কবি **বিষ্ণু দে** (১৯০৯-১৯৮২)। তিরিশের যুগে বাংলা কবিতায় মৌলিক রচনাগুণে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন বিষ্ণু দে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ইংরেজি ও ফরাসী সাহিত্য শুরু করে স্পেন থেকে চীন, রাশিয়া থেকে আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর কাব্যের ঔদার্য শুধু বিভিন্ন দেশকে অতিক্রম করে নয়, কালের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। অর্জুনের প্রতীকের সঙ্গে হ্যামলেটের প্রতীক, আর্টেমিমের চিত্রকল্পের সঙ্গে উর্বশীর চিত্রকল্প, ক্রবাদুর সংগীতের সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে বারোমাস্যা, লোরকা এলুয়ারের বিপ্লবী চেতনার বিদগ্ধ রুচির ওঁরাও, সাঁওতাল, ছত্রিশগড়ি প্রাণের আদিম উৎসাহ প্রভৃতি বিষয় তার কাব্যে উঠে আসে। তবে রেনেশাঁসের মোহে তিনি মধ্যযুগকে ভোলেননি। তাই তিনি কবিতা রচনা করতে গিয়ে অনেকসময় ফিরে গেছেন মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে। 'আলেখ্য' (১৯৫২-'৫৮) কাব্যগ্রন্থের '**এবং লখিন্দর**' কবিতাটিতে কবি হৃদয়ের রোম্যান্টিক আবেগ ও দার্শনিক মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বিচরণ করেছেন মনসামঙ্গলের পরিমণ্ডলে। এই সূত্রে কবির প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির নাম জেনে নেওয়া যাক—

১. ঊর্বশী ও আটোমিস' (১৯২৬-৩২ খ্রী:)

২. 'চোরাবালি' (১৯৩৮খ্রী:)

৩. 'পূর্বলেখ' (১৯৪০ খ্রী:)

৪. 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৪ খ্রী:)

৫. 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭ খ্রী:)

৬. 'অন্বিষ্ঠ' (১৯৫০ খ্রী:)

৭. 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০ খ্রী:)

৮. 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪ খ্রী:)

৯. 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৫৫-৫৮ খ্রী:)

১০. 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' (১৯৫৫-৬১ খ্রী:)

১১. 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৫৮-৬৫ খ্রী:)

১২. 'সংবাদ মূলত কাব্য' (১৯৬২-৬৬ খ্রী:)

১৩. 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' (১৯৬৬-৬৯ খ্রী:)

১৪. 'রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে' (১৯৬৯-৭১ খ্রী:)

১৫. 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' (১৯৬৯-৭৩ খ্রী:)

১৬. 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' (১৯৭৪-১৯৭৫ খ্রী:)

১৭. 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৫-৭৬ খ্রী:)

১৮. 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' (১৯৭৬-৭৯ খ্রী:) প্রভৃতি।

কুড়িটি চরণে রচিত দৃঢ় গঠনের সনেট জাতীয় 'এবং লখিন্দর' কবিতায় আধুনিক যুগযন্ত্রণাময় প্রেমচেতনা উঠে এসেছে। মনসামঙ্গলের বেহুলা বাসর রাতেই বিধবা হয়। প্রেমের পরিতৃপ্তি সে কখনোই পায়নি। অপরিতৃপ্ত প্রেম বুকে নিয়ে সে মৃত স্বামীর সঙ্গে ভেসে চলে গাঙ্গুড়ের জলে। স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক আশা-স্বপ্ন নিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে দিনের পর দিন গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায়। কবি হৃদয়ও বেহুলার মতো আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়ের ভেলায় ভেসে চলেছে। এই যাত্রীর স্রোতের সাথেই সখ্যতা। কবিতার প্রথমেই কবির ভাষায় উঠে এসেছে—

> ''হৃদয় তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী!
> তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,
> কখনো জোয়ারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো,
> তোমার সে রূপ বেহুলার মতো চিনি।''[১৯]

আধুনিক প্রেম বেহুলার মতো নিঃসঙ্গ। বেহুলার যন্ত্রণার মতোই তৎকালীন প্রেম যন্ত্রণামুখর। এই প্রেম স্রোতস্বিনীর মতই বহমান। কখনো জোয়ারে ফুলে ফেঁপে ওঠে, কখনো বা ভাটার টানে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এই প্রেম। স্মৃতিতে যাওয়া-আসা করে এই প্রেম, কখনো মন চঞ্চল হয়ে পড়ে। অভিমান নয়, এই প্রেমের সাহচর্যেই চলেন কবি। কবি নিজে কথা বলেন না, অন্তর থেকে ভেসে আসে এই প্রেমের কথা। আশাবাদী কবি জানেন রক্তের স্রোতে প্রেম খরতোয়া। কবি এই ঊর্মিল জলে আসনপিড়ি পেতেছেন। ঘাটের সিড়ি জলে থৈ থৈ করলেও কবি 'পলিচড়া'কেই সার্থকতা মনে করেন। তাই তিনি নতুন করে উৎসাহ খুঁজে পান। মহাজনী মাল্লার গান, পান্সি মাঝির ভাটিয়ালি গান ব্যথা ভুলে থাকার আবেশ ও অবিরাম পথ চলার অনুপ্রেরণা জোগায়। বেহুলার অনিশ্চিন্ত যাত্রার মতো আধুনিক প্রেমও অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। পাওয়া-না পাওয়ার দ্বন্দ্বে আধুনিক প্রেম মুখরিত। এই দ্বন্দ্বের কারণেই আধুনিক মানুষ অস্থির। অস্তিত্বের সংকটের স্বীকার হয় মানুষ, কোথাও তার শান্তি নেই। জীবনের অথই সাগরে মৌন মানুষ শুধু তক্তায় ভাসে। জীবনের সবকিছুই মিথ্যে হয়ে যায় আধুনিক মানুষের কাছে। বর্তমানের এই অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে বেহুলার মতো নিশ্চিতপথে চলেছে আধুনিক মানুষ। লখীন্দর-সহ কাঠ, খড়, ফুল যেমন ভেসে যায় নদীতে। আধুনিক প্রেমও ভেসে চলেছে নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে। বাস্তব জীবনের এই সত্যকে তুলে ধরেছেন এইভাবে—

> ''কত ডিঙি ভাঙো, যাও কত বন্দর,
> কত কী যে আনো, দেখো কত বিকিকিনি,
> তোমার চলায় ভাসাও, স্রোতস্বিনী।
> কাঠ খড় ফুল— এবং লখিন্দর।।''[২০]

এই ভাবে কবি বেহুলা ও লখীন্দরের জীবন ইতিহাসকে আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে নিয়ে এসে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন। সামাজিক অবক্ষয়, মানবিক মূল্যবোধহীনতার মধ্যে আধুনিক প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন কবি। লখীন্দর এখানে বিপন্ন সময়ের প্রতীক। যার মধ্যে রয়েছে বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা। আর এই আশাবাদকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির সময়ের বিপন্নতাটিও 'কাঠ', খড়, ফুল প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে সাংকেতিক হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের অনুষঙ্গ এখানেই নতুনভাবে উঠে এসেছে পাঠকের সামনে।

বিষ্ণু দের 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের 'সে বলে' কবিতাটিতে বেহুলার প্রসঙ্গ এসেছে। প্রেমমূলক এই কবিতাটিতে প্রেমিকাকে সাবিত্রী ও বেহুলার থেকেও অতুলনীয় ভাবা হয়েছে। শেষ ফুল শয্যার

রাত পর্যন্ত প্রেমিককে আচ্ছন্ন করে থাকবে এই প্রেমিকা। নিঃসঙ্গের দিনে কবিকে সঙ্গ দিবে সে। কবির ভাষায় ফুটে উঠেছে প্রেমের এই চিত্ররূপ—

''সে বলে, জীবন হবে নাকি দুঃসহ
সাবিত্রী নয়, বেহুলাও নয় তুল্য;
সে নাকি মৃত্যুনাট্যে সতীর মূল্য
দিতে চায় তাই একান্তে অহরহ
আমার প্রেমের পাথেয় সে হাতে হাতে
ছেদ দেবে শেষ ফুলশয্যার রাতে।''[২১]

এইভাবে বেহুলার প্রসঙ্গ এনে আধুনিক মানবীর প্রেমকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন কবি। কবি এখানে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের ঘটনার আবরণকে অতিক্রম করে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়েছেন। কবির চোখে বাস্তব প্রেম কঠিন ও কঠোর। তাতে হৃদয়ের লেশমাত্র নেই। সেই যুগচেতনায় মনসামঙ্গলের কাহিনীকে বৃহত্তর জীবনের ব্যঞ্জনায় নতুন করে গড়েছেন কবি। মধ্যযুগের সামাজিক ভাবনাকে সম্পূর্ণ ভেঙে আধুনিক সংকটময় জীবনে তাকে স্থান দিয়েছেন আধুনিক কবি বিষ্ণু দে।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রবীণ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জিয়া হায়দারের (১৯৩৫- ) মোট পাঁচখানা কবিতা আমরা পাই যা মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে লেখা। সেগুলি হল 'কৌটোর ইচ্ছেগুলো' (১৯৬৮ খ্রী:) কাব্যগ্রন্থের—

১. লখিন্দর
২. বেহুলা
৩. সনকা
৪. চাঁদ সদাগর
৫. মনসা

কবিতাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার যে কবি জিয়া হায়দার পৃথক রাষ্ট্রের হলেও সাহিত্যজগত ও মানুষের চিন্তন-মননের দিক দিয়েও বাঙালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সবই একইরকম। আর মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা পূর্ববঙ্গেও প্রচার লাভ করে। আধুনিক যুগেও ওপার বাংলার সাহিত্য জগতে মনসামঙ্গল কাব্যে প্রভাব ব্যাপকভাবে রয়েছে। কবি জিয়া হায়দারের কাব্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কবির প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে হল—

১. 'একতারাতে কান্না'

২. 'কৌটোর ইচ্ছেগুলো'

৩. 'দূর থেকে দেখা'

৪. 'আমার পলাতক ছায়া'

৫. 'লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা' প্রভৃতি।

মোট ৬৮ টি চরণে **'লখিন্দর'** কবিতাতে মনসামঙ্গলের অন্যতম চরিত্র লখীন্দরের মধ্যে আধুনিক যুগের আত্মসংকট ও হতাশায় পরিপূর্ণ এক যুবকের আত্ম আবিষ্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। লখীন্দরের নতুন জীবন শুরুতে লোহার বাসরঘর যেমন দমবন্ধ করে দেয়। কবি এর আড়ালে আধুনিক কলুষিত পৃথিবীতে এক যুবকের কথা তুলে ধরেছেন। আজকের লখীন্দর সতী নারী বেহুলার নিষ্পাপ প্রেম নিয়ে বাঁচতে চায়। বাসর রাত্রে মঙ্গলধ্বনি কামনা করে আত্মার আত্মীয়, পয়মন্ত লক্ষ্মী সুলক্ষণা, কল্যাণময়ী বেহুলার কাছে আহ্বান করে—

''কোনো শব্দ নেই, কোনো ধ্বনি;
কেমন নিঃসাড় পৃথিবীর নাটমঞ্চ যতো,
বেহুলা, আমার প্রেম, কথা বলো প্রেম;
কোনো ধ্বনি, শব্দের অস্ফুট উচ্চারণে
হীরের ছুরির মত কেটে দাও এই
ভয়াবহ নিস্তব্ধতা; প্রেম আনো আমাদের প্রথম রাত্রিতে।''[২২]

এই লখীন্দর সমস্ত বিচ্ছেদকে দূর করতে চায় বেহুলাকে আলিঙ্গন করে। মানুষের মঙ্গলের জন্য আজকের লখীন্দর মৃত্যুকে বরণ করতেও রাজি। যদি ধূলিধূসরিত পৃথিবীতে স্বর্গের সিংহাসন অর্থাৎ সমস্ত সুখ শান্তি ফিরে আসে, তবে মৃত্যুকে বরণ করে যুবক। এই ভাবে দেখি আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসাকে তুলে ধরতে গিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন লেখক।

**'বেহুলা'** শিরোনামের কবিতাটি নারীর অধিকার চেতনার কথা উঠে এসেছে। বেহুলা যেমন কোন অপরাধ না করেও বাসর রাতে বিধবা হয়ে দুঃখভোগ করে। বাস্তবেও নারী পরিবারের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দেয়। শ্বশুর বাড়ির গঞ্জনা, অত্যাচার সহ্য করেও সন্তানপ্রতিপালন করে পুরুষকে সুখী করে নিজে সুখী হয়। তাই তার মুখে শোনা যায়—

''আমি যে সন্তান দেবো আগামী পৃথিবীকে, আমি

প্রেমের মাধুরী দেবো পুরুষের উপোষী অধরে
আমি যে ওড়াবো পায়রা সংসারের বিলাশ আকাশে,
প্রীতিস্নেহ ভালোবাসা মমতার উদার সাগরে
সিক্ত করবো নিজেকে, এবং
বৃষ্টির আদরে আমি ছড়বো আবার।"[২৩]

একইরকম ভাবে কবির '**সনকা**' শিরোনামের কবিতাটিতেও নারীর কথা উঠে এসেছে। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের সনকা কোন অপরাধ না করেও সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা মেনে নিয়েছিল নিয়তির বিধান বলে। কিন্তু আজকের সনকা সরাসরি স্বামী চাঁদ সদাগরকে প্রশ্ন করে—

"কিন্তু আমি হতভাগী নারী
কোন্ দোষে দোষী বলো?"[২৪]

দয়ামায়াহীন স্বামীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সহধর্মিনী হলেও ভুল পথে সে চলতে নারাজ। নিজের সুখের সংসার, হৃদয় স্নেহের জন্য মনসার পূজা দিতেও চায়। কবি জিয়া হায়দার নিজের দেখা নারীর যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতে গিয়ে হাত বাড়িয়েছেন ঐতিহ্যশালী চরিত্র সনকার দিকে। জীবনভর স্বামীর কথা মুখ বুজে সহ্য করলেও জীবনের শেষ সীমায় এসে স্বামীর প্রতি প্রশ্ন তুলে। নারী ধৈর্য্যের বাঁধ আর থাকে না। এই সূত্রে আমাদের মনে করিয়ে দেয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের শকুন্তলা, কৈকেয়ী, জনা প্রভৃতি চরিত্রগুলি।

তাঁর '**চাঁদ সদাগর**' কবিতাও নারীর প্রতি অবজ্ঞা পুরুষের, তা চাঁদ সদাগরের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে পৌরুষত্বের দাম্ভিকতা, তা উঠে এসেছে চাঁদ বণিকের বক্তব্যে—

"অন্তত দু'দিক সে কি দেখতে পারে, এক চক্ষু যার?
ভাবিস্ কেমন করে তাকে আমি পূজো দেবো, ওরে
মূঢ়া নারী। যেখানে আমার শিব-সুন্দর পরম,
লক্ষ্মী যাঁর গৃহিণী কল্যাণী!"[২৫]

তবে পুত্রবধূ বেহুলার কাছে হার মানতে হয় চাঁদ বণিককে। আসলে এই হার স্নেহের হার। আশাবাদী কবি নারীর প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। এই দিক থেকে কবিতাটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে।

কবির 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থের '**মনসা**' নামক কবিতাটিতে মনসাদেবীর এক ভিন্নরূপ

দেখি। মোট ৭০ টি চরণের এই কবিতার প্রথমার্ধে বেহুলার প্রতি মনসার ব্যঙ্গোক্তি দেখা যায় যা মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা পাই না। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলার জীবন তুচ্ছ করে ভেসে যাওয়াকে সমর্থন করেনি মনসা। বরং মনসার কাছে তা নিন্দনীয়। আসলে নারীকে সচেতন হতে হবে তা কবিতায় তুলে ধরেছেন। মনসা দেবীর মতে স্বর্গের উৎস কোথাও নেই, যেখানে বেহুলার কষ্টের মহিমা বুঝবে। যার জন্য সমস্ত ত্যাগ, বেহুলার সেই লখীন্দর বেহুলাকে বুঝবে না। দেবীর মতে প্রেম-প্রীতি সব কিছুই যেন মিথ্যে। তাই বেহুলাকে সতর্ক করে মনসা বলে—

> ''স্বর্গের নেই উৎস কোথাও এখন,
> লক্ষীন্দর দেবেনা আদর তোমাকে,
> যতোই তোমার তুলসীতলার মানত
> হোকনাকো নিষ্কলুষ, যতোই হওনা
> লক্ষ্মী অথবা সতী সুন্দরী বেহুলা;''[২৬]

পরক্ষণে কবিতার শেষ পর্বে আবার দেখি চাঁদ সদাগরকে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ করে মনসা। নানা প্রতিজ্ঞা ও বলিষ্ঠতার পরে চাঁদ মনসার পূজা দিতে বাধ্য হয়। মিথ্যা দাম্ভিকতাকে আশ্রয় করে চাঁদ বাম হাতে হলেও অবশেষে মনসার পূজা দেয়। পৌরুষত্বের গর্ব, আদর্শ, দম্ভ, সবই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় চাঁদের। তবে দেবীর পূজায় আশীর্বাদ স্বরূপ ঘরের লক্ষ্মী আবার ফিরে আসবে। দেবীর কৃপায় আবার পৃথিবীর অর্থ, কাম যত আছে সবই হবে আবার। আত্মসেবাই যে পরম দেববাণী এবং পার্থিবতায় যে স্বর্গের মত সুখ তা অনেক পরে বুঝতে পারে সদাগর। তাই বাম হাতে হলেও পূজা দিতে রাজি হয় সদাগর। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে কবি মনসার মানসিক বিবর্তনের দিকটি সত্যিই প্রশংসনীয়।

পরিশেষে বলা যায় কবি জিয়া হায়দার সমকালের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করতে হাত বাড়িয়েছেন মনসা পুরাণের দিকে। একদিকে লখীন্দরের মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ প্রতীকীভাবে যুবশক্তির অসহায়তাই উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে মানুষের আত্মসংকট স্পষ্ট হয়েছে চারিদিকে লৌহবাসরের চিত্রকল্পে। অন্যদিকে বেহুলা, সনকা ও মনসার চরিত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক নারী চেতনা ও জীবন জিজ্ঞাসার দিকটি চিত্রিত করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর প্রতিটি কবিতা হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের আধুনিক নবনির্মাণ।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ শতকের তিন, চার ও পাঁচের দশকে আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যের অসমান্য প্রতিভা **সঞ্জয় ভট্টাচার্যের** (১৯০৯-১৯৬৯)। একাধারে চিত্রশিল্পী, কবি, সমালোচক বলে

চিরপরিচিত। এমনকি তিনি 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক ও পূর্বাশা প্রকাশনার প্রতিষ্ঠাতাও। রবীন্দ্রমনোভাবের বিরোধিতার সময়ে বাংলা সাহিত্যে যে অস্থিরতা পরিমণ্ডল তৈরি হয় সেই সময়েই কবিতার ক্ষেত্রে যাত্রা শুরু সঞ্চয় ভট্টাচার্যের। তার প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

১. 'সাগর ও অন্যান্য কবিতা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)

২. 'পৃথিবী' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৯ খ্রী:)

৩. 'সংকলিতা' (প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৪২ খ্রী:)

৪. 'নতুন দিন' (প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৭খ্রী:)

৫. 'প্রাচীন প্রাচী' (প্রথম সংস্করণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৮ খ্রী:)

৬. 'যৌবনোত্তর' (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮ খ্রী:)

৭. 'অপ্রেম ও প্রেম' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ খ্রী:)

৮. 'পদাবলী' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩ খ্রী:)

৯. 'সবিতা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ খ্রী:)

১০. 'উত্তর পঞ্চাশ' (প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ খ্রী:)

১১. 'উর্বর-ঊর্বশী' (প্রথম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ খ্রী:)

১২. 'অগ্রন্থিত কবিতা' (রচনাকাল ১৩৪৬-১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের '**বেহুলা**' কবিতাটি 'অলিন্দ' পত্রিকার ৮ সংখ্যা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। পরে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার কাব্যগ্রন্থে গৃহীত হয়। মোট ৮টি চরণে এই কবিতায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত 'মিথ' ও 'লোকপুরাণ' অনুরসরণে সমকালের বিধ্বস্ত সময়ের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের ছয়-সাত দশকের সমাজে যে অস্থিরতা, বিপন্নতা তা তুলে ধরতে গিয়ে অতীত ঐতিহ্যের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। সমকালের জীবনী শক্তিকে তুলে ধরতে মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলাকে আশ্রয় করেছেন। বেহুলাকে তাই কবির আহ্বান—

> ''নাচো নাচো বেহুলা আমার,
> বর্ষণ-ভোলানো নাচ নাচো,
> নদী উৎসে এসে গেছে।''[২৭]

'নদী উৎসে এসে গেছে'— অর্থাৎ সমাজ উন্নয়নের সমভাবনা রয়েছে প্রবল। কিন্তু কবি নিজেকে অসহায় মনে করেন। ফুল্ল নগরের এক মৃত প্রাণ মনে করেন নিজেকে। নতুন দেশ ও জাতি গঠনে অন্যায়কারীরা যে বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করে তাতে সমাজের কল্যাণ হতে পারে না। কবির তাই

প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে এখানে। নাগিনী স্বরূপ অত্যাচারীর দল বর্ষণ উৎসবে নৃত্য করে। এই নাগিনীদের পরাভূত করতে নারীশক্তির প্রতিরূপ বেহুলাকে আহ্বান করেছেন। সর্পদংশনে নিহত লখীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা গাঙ্গুরের জলে ভেসে যায়। তার একনিষ্ঠতা ও মনোবলের কাছে হার মানে দেবসভার দেবতাগণও। স্বামী ও ছয় ভাসুরকে জীবিত ফিরিয়ে আনে। সর্পদেবী মনসাও বেহুলার পাতিব্রত্য ও সততায় মুগ্ধ হয়ে ক্রুরতাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কবি বর্তমান সমাজের এই দূরাবস্থায় পুরাণের সেই নারী শক্তিকেই আহ্বান জানিয়েছেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনসা-কথাকে কাব্যের গঠনশৈলী হিসেবে না নিয়ে মনসামঙ্গলকাব্যের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। বর্তমান সময়কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে মধ্যযুগের নারীর সেই সম্মোহনী শক্তিকেই নিয়ে এসেছেন। যার কাছ থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচার মন্ত্র দিতে চান কবি। সবাইকে নিয়ে সেই সাহসিনী শক্তির ভেলায় ভাসতে চান। বেহুলা হয়ে ওঠে তেজ ও দৃঢ়তার প্রতীক। সাধারণ মানুষের রক্তের উত্তেজনা হয়ে ওঠে এই বেহুলা। কবির মুখে তাই শোনা যায়—

> ‘‘—শরবিদ্ধ প্রাণ
> তোমার ভেলায় যদি নিলে
> নাচো জল, নাচো রক্ত, বেহুলা আমার।’’[২৮]

কবি এইভাবে বর্তমান সময়কে তুলে ধরতে গিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের নতুনভাবে রূপায়ণ করেন।

উত্তাল চল্লিশের দশকে সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রত্যয়ী মানসিকতা নিয়ে বাংলা কাব্যজগতে পদার্পণ ঘটে প্রখ্যাত কবি **অরুণ মিত্রের** (১৯০৯-২০০০)। তাঁর কবিতায় বাস্তবের নানা ঘটনার সঙ্গে রোমন্যান্টিকতা মিশে এক নতুন রোম্যান্টিকতার সৃষ্টি হয়েছে। গদ্যভাষায় অত্যন্ত সহজ সরল কথায় তৎকালীন সময়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে এই সহজ ভাষায় উঠে এসেছে গভীর এক ব্যঞ্জনা। শব্দব্যবহারে, চিত্ররচনায়, নানা অলংকার সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ নৈপূণ্যের পরিচয় দিয়ে বাংলা কাব্যজগতে নতুন ঐতিহ্যের নির্মাণ করেছেন। একদিকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, জনগণতান্ত্রিক চেতনা, মুক্তিযুদ্ধ, হাতুড়ি, ইস্তাহার। অপরদিকে শান্ত স্নিগ্ধ জীবনের স্রোত, অফুরন্ত প্রকৃতির রূপময়তা, রোদছায়া, সবুজ গাছপালা, খোয়ামাটির অপূর্ব রহস্যময়তা তাঁর কবিতাকে অনন্যমাত্রা দান করেছে। অরুণ মিত্রের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে হল—

১. ‘প্রান্তরেখা’ (১৯৪৩ খ্রী:)

২. ‘উৎসের দিকে’ (১৯৬৫ খ্রী:)

৩. 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬৩ খ্রী:)

৪. 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' (১৯৭০ খ্রী:)

৫. 'শুধু রাতের শব্দ নয়' (১৯৭৮ খ্রী:)

৬. 'প্রথম পলি শেষ পাথর' (১৯৮১ খ্রী:)

৭. 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর' (১৯৮৬ খ্রী:)

৮. 'যদিও আগুন ঝড় ধসাভাঙা' (১৯৮৮ খ্রী:)

৯. 'এই অমৃত, এই গরল' (১৯৯১ খ্রী:)

১০. 'টুনি-কথার ঘেরাও থেকে বলছি' (১৯৯২ খ্রী:)

১১. 'খরা-উর্বরায় চিহ্ন দিয়ে চলি' (১৯৯৪ খ্রী:)

১২. 'অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে' (১৯৯৬ খ্রী:)

১৩. 'ওড়াউড়িতে নয়' (১৯৯৭ খ্রী:)

১৪. 'ভাঙনের মাটি' (১৯৯৮ খ্রী:)

**অরুণ মিত্রের** 'ভাঙনের মাটি' (১৯৯৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত '**ও বেহুলা**' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা। গদ্যকবিতার আদর্শে রচিত এই কবিতায় বাস্তব জগতের নানা প্রশ্ন তুলে ধরেছেন কবি। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা লখীন্দরের কাহিনীকে অবলম্বন করে আধুনিক সংকটময় জীবনের সত্যতাকে তুলে ধরেছেন কবি। মনসামঙ্গল কাব্যে নিছনি নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলা নৃত্যপটিয়সী, কর্মনিপূণা, সতিসাধ্বী নারী। সে লোহার কলাই সিদ্ধ করে চাঁদ সদাগরের গৃহের পুত্রবধূর যোগ্যতা প্রমাণ দেয়। কিন্তু প্রতিপ্রাণা এই নারীর কপালে দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই জোটে না। চাঁদ সদাগরের সাথে মনসার দ্বন্দ্বের কারণে বাসররাতে প্রাণ হারাতে হয় লখীন্দরকে। সদ্য বিবাহিতা বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যায় গাঙ্গুড়ের জলে। বিশ শতকের কবি অরুণ মিত্র বেহুলার এই করুন চিত্রকে তুলে ধরেছেন নানা জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে। মাঝরাতে কবির বিছানায় ঢেউ লাগলে, অর্থাৎ মনের মধ্যে দোলাচলতা সৃষ্টি হলে বেহুলার সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। কবি বক্তব্য, লোহার বাসর ঘরে কালনাগিনী দ্বারা দংশিত লখীন্দরকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যায় বেহুলা, স্বামীকে একলা ভেসে যেতে দেয়নি। সমাজের বিধানকে অতিক্রম করে সে স্বামীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাড়ি দেয়। সেটা তবে আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ বেহুলা লখীন্দরকে ভীষণ ভালোবাসে এবং এই ভালোবাসার তেজ হল দুর্দান্ত। সব বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে হাজির হয় দেবতাদের আড্ডায়।

সেখানে সবাইকে নাজেহাল বেসামাল করে, সকলের মন জয় করে লখীন্দরকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনে বাড়িতে। বেহুলার নামে ধন্য ধন্য পড়ে যায় সারা দেশে। মানুষের স্লোগান ওঠে বেহুলার পাতিব্রত্যতার জন্য। পূণ্যভূমির আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় তার পতিভক্তি ও সতীসাধ্বী তক্‌মার পুরস্কার। বেহুলার এই সতীত্বের কথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু আধুনিক মনোভাবাপন্ন কবি বেহুলার প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়—

> ''ও বেহুলা, এখন বলো তো আমায় লোহার বাসর ঘরে অন্ধকারে সাপটা
> যদি ভুল করে লখীন্দরের বদলে তোমাকে ছোবল দিত, তাহলে কী হত।''[২৯]

প্রশ্ন শুনে বেহুলা মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে। নিরুত্তর বেহুলাকে কবি উত্তরে বলেন যে, লখীন্দর যত্ন করে বয়ে নিয়ে যেত, অতি যত্নে কলার ভেলায় শোয়াত। তারপর ভেলা ভাসিয়ে দিত জলে। কিন্তু সে নিজে দাঁড়িয়ে থাকত ডাঙাতেই এবং ডাঙার উপর দিয়েই ভাঙা হৃৎপিণ্ড নিয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি ফিরে আসত। পত্নী হারানোর বিরহে তুষের আগুনে দিনরাত পুড়ত লখীন্দর। দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে সংসারে টিকে থাকত কিছুদিন। কিন্তু মাস দুই কাটতে না কাটতেই লখীন্দরের কাছে বিরহ এত অসহ্য হয়ে উঠল সে পুনরায় সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। বেহুলার মত অপরূপ সুন্দরী না হলেও কোন অসুবিধে নেই।

কবি অরুণ মিত্র সহজ সরল কথার মাধ্যমে এক গভীর গূঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। মানুষ বিংশ শতকের দোরগোড়ায় এসেও নারীর প্রতি অবহেলা, অন্যায় অত্যাচার থেকে বিরত থাকেনি। যুক্তিবাদী কবির মন কিছুতেই তা মেনে নিতে পারেনি। তাই বর্তমানের চিত্রকে তুলে ধরতে গিয়ে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের পতিব্রতা নারী বেহুলাকে নিয়ে এসে তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। নারীজাতির জাগরণের প্রয়াস লক্ষ করা যায় কবিতায়। শুধু তাই নয়, সমকালের মানুষের মূল্যবোধ, আদর্শ, বিভিন্ন ঘটনার নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বাস্তব সচেতন মানসিকতাটিকে নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে 'অতীত' ও বর্তমানের মানসিকতার বিবর্তনটি নতুনভাবে বিশিষ্ট হয়েছে। আজকের মানুষের দুর্বলতা, স্বার্থশীলতা, অসহায়তা ও বাস্তবতাকে তিনি সহজ সরলভাবে তুলে ধরতে গিয়ে লোকপুরাণের ঐতিহ্যকেই মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাই 'ও বেহুলা' কবিতাটি পুরোপুরি হয়ে উঠেছে প্রচলিত মনসাপুরাণের নবনির্মাণ। এইভাবে কবি অরুণ মিত্র মনসাপুরাণের কাহিনীর বেহুলা চরিত্রকে আধুনিক সংকটময় পরিস্থিতিতে নিয়ে এসে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন তাকে। কবিতার আকারে মনসামঙ্গলের বেহুলা হয়ে উঠেছে আধুনিক এক প্রতিবাদী নারী চরিত্র। এই দিক দিয়ে কবি অরুণ মিত্রের 'ও বেহুলা' কবিতাটি হয়ে

উঠেছে এক নতুন মঙ্গলকাব্য। সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর' গ্রন্থে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> ''এইভাবে কবি সহজ সরল অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন। নির্মাণ করেন প্রচলিত মনসাপুরাণের আধুনিকতম ও বাস্তবধর্মী শিল্পরূপ।''[৩০]

তাই বলা যায় কবি অরুণ মিত্রের 'ও বেহুলা' কবিতাটি হয়ে উঠেছে মনসা-কথার সার্থক নবনির্মাণ।

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম কবি হলেন **শঙ্খ ঘোষ** (১৯৩২- )। বাংলা কাব্য সাহিত্যের জগতের স্বতন্ত্র মেজাজের কবি শঙ্খ ঘোষ। তিনি দেখেছেন দেশ-ভাগের যন্ত্রণা, গ্লানি, দেখেছেন নিঃস্ব মানুষের হাহাকার, খাদ্যের সারিতে দাঁড়ানো মানুষের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু। তিনি আরো খুব কাছ থেকে দেখেছেন তেভাগা আন্দোলন, ষাটের দশকের নক্‌শাল আন্দোলন, মানুষের মূল্যবোধের ক্রমিক অবক্ষয়, মানুষের আদর্শের অপঘাত ও মনুষ্যত্বের মৃত্যু। আর এগুলিই রূপায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায়। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দায়বদ্ধতা থেকে কবি শঙ্খ কলম ধরেন। তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে হল—

১. 'দিনগুলি রাতগুলি' (রচনা ১৯৪৯-৫৫/প্রকাশ ১৯৫৬)

২. 'নিহিত পাতালছায়া' (রচনা ১৯৬০-৬৬/প্রকাশ ১৯৬৭)

৩. 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' (রচনা ১৯৬৭-৬৯/প্রকাশ ১৯৭৮)

৪. 'আদিম লতাগুল্মময়' (রচনা ১৯৭০-৭১/প্রকাশ ১৯৭২)

৫. 'মুর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' (রচনা ১৯৭২-৭৩/প্রকাশ ১৯৭৬)

৬. 'বাবরের প্রার্থনা' (রচনা ১৯৭৪-৭৬/প্রকাশ ১৯৭৬)

৭. 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' (রচনা ১৯৭৬-৭৮/প্রকাশ ১৯৮২)

৮. 'প্রহরজোড়া ত্রিতাল' (রচনা ১৯৭৭-৮১/প্রকাশ ১৯৮২)

৯. 'বন্ধুরা মাতি তরজায়' (রচনা ১৯৭৬-৮০/প্রকাশ ১৯৮৪)

১০. 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' (রচনা ১৯৮২-৮৩/প্রকাশ ১৯৮৪)

১১. 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' (রচনা ১৯৮৪-৮৬/প্রকাশ ১৯৮৭)

১২. 'লাইনেই ছিলাম বাবা' (রচনা ১৯৯০-৯৩/প্রকাশ ১৯৯৩)

১৩. 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' (রচনা ১৯৮৭-৯৪/প্রকাশ ১৯৯৪)

১৪. 'শবের উপরে শামিয়ানা' (রচনা ১৯৯৬৪-৯৬/প্রকাশ ১৯৯৭)

১৫. 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার' (রচনা ১৯৯৭-৯৮/প্রকাশ ১৯৯৯)

১৬. 'জুলাই পাষাণ হয়ে আছে' (রচনা ২০০১-০৩/২০০৪)

১৭. 'সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি' (২০০৪-০৬/রচনা ২০০৭)

শঙ্খ ঘোষের '**হেতালের লাঠি**' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়। পরে এটি 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আঠেরোটি চরণে রচিত এই কবিতা দুটি স্তবকে বিন্যস্ত। প্রথম স্তবক আটটি এবং দ্বিতীয় স্তবক দশটি চরণে বিভক্ত। বর্তমানের সমস্যা, অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ানোর জন্য কবি আশ্রয় নিয়েছেন মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ বণিক ও তার হেতালের লাঠির কাছে। দৃঢ় প্রত্যয়ী, নির্ভীক চাঁদ ও তার হেতালের লাঠিকে তিনি প্রতীকী প্রহরীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন যে— কবিতা হলো তাই, যা আমাদের অধিচেতনা আর অবচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দেয় আমাদের সময়ের চেতনাকে। কবিতা আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের একটা কিছুতে এনে বাঁধে। 'হেঁতালের লাঠি' কবিতাটিতে কবি অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতির অবক্ষয়ের মুহূর্তে প্রহরী স্বরূপ চাঁদ বণিককে দাঁড় করিয়েছেন কবি। কবিতার প্রথমেই তাই আমরা পাই—

> ''হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
> কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
> এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
> শিয়রে কুন্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।''[৩১]

কবি হেতালের লাঠিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিবাদের কারণে পুত্র লখিন্দরের বাসররাতে মৃত্যু হয় সর্পদংশনে। বিশ শতকের আটের দশকে দাঁড়িয়ে কবি শঙ্খ ঘোষ এই অন্যায়কে মেনে নেন। আজকের নিরাপরাধ বেহুলা-লখিন্দরকে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে শুভ ভবিষ্যৎ-এর দিকে নিয়ে যেতে আগ্রহী। তাই তিনি লোহার সিঁড়িতে বসে পাহারা দেন, অন্ধকারময় পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার আশায় রাত জেগে থাকার কথা ভাবেন। এই কালরাত্রে কোন ফণা এসে দংশন না করতে পারে তাদের। এই শুভ মুহূর্তে; প্রেমের প্রহর কেটে যাক। কিন্তু এক বড় ঘুম কালঘুম, মায়াঘুম এসে চোখ জড়িয়ে

ফেলে। ক্লান্তি, অবসাদ এসে পড়ে শিরা-উপশিরায়। চেতনাঘেরা নাগিনীপিচ্ছিল অন্ধকারে শরীর অবশ হয়ে এসে ঢিল হয়ে পড়ে মুঠি হাত থেকে ঘসে পড়ে হেতালের লাঠি। আসলে কবি বেহুলার লখিন্দরের চিত্রকল্পে তৎকালীন সময়ের এক আদর্শবাদী ব্যক্তিত্বের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই ব্যক্তিত্ব দেশ ও সভ্যতাকে নতুনভাবে গড়ে তুলবেন, সৃষ্টি করবেন নতুন সমাজ, প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণতান্ত্রিক চেতনার অধিকার। নিরলস এই কর্মযজ্ঞে যারা পরিশ্রম করে চলেছে তাদের সামনে নানা বিপদ। মনসা স্বরূপ অশুভ শক্তি গ্রাস করতে চায় সমস্ত মঙ্গলময় পরিস্থিতিকে। এই চেঙমুড়ি কানী নতুন ঔপনিবেশিকতার জাল পেতে মানুষকে যন্ত্রণা, হতাশা, হাহাকার ও সর্বহারার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কবি এই বুর্জোয়া শাসনের শক্তিকে প্রতিহত করতে হেতালের লাঠিকে অবলম্বন করেছেন। মনসামঙ্গলের চাঁদ যেমন সত্যের পথে চলতে গিয়ে নানা বাঁধা-বিপত্তির মধ্যে পড়ে। হারাতে হয় ছয়-পুত্র ও চৌদ্দ ডিঙা মধুকর। ভিখিরির বেশে বাড়ি ফিরে সর্বস্ব হারিয়ে। মহাজ্ঞান কবচ হারিয়ে যেমন অসহায় হয়ে পড়ে। তেমনি তার বাড়িও পরিণত হয় শ্মশানে। তবু চাঁদ আশা হারায়নি। স্বপ্ন দেখেছেন আবার নতুন করে সবকিছু গড়ে তোলার আশায়। কবিতার মধ্যেও দেখি কবি আশার আলো খুঁজতে থাকেন। কবিতার শেষ স্তবকে তাই কবির মুখে শোনা যায়—

> ‘‘তারও মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি
> দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবীর সুন্দরতর ক’রে
> নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে
> আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর।’’[৩২]

নিজের আপনজন ও ধনসম্পদ রক্ষার্থে চাঁদ সদাগর যেমন হেতালের লাঠি ব্যবহার করেছিলেন। বিশ শতকেও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি স্বপ্নের ভিতর দিয়ে স্বপ্ন দেখতে চান। সত্যকে জয় করতে চান তিনি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তার স্বপ্নের বেহুলা-লখিন্দর হেঁটে চলেছে পৃথিবীকে সুন্দরতম করে। কিছু এই মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্যে তারা হেঁটে চলেছে কোন নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে। তারা যতদূর যায়, শুধু মাঠভরা ধান। এখানে বেহুলা-লখীন্দর ও ক্ষেতভরা ধানের অনুষঙ্গে কবি দেশের ভবিষ্যৎকে তুলে ধরেছেন। প্রেম ও সবুজের পথ দিয়েই পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। এই মহান কর্মযজ্ঞে শুধু পুরুষ নয়, নারী ও পুরুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এগিয়ে চলে। তারা পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলার স্বপ্ন নিয়ে নতুন পথে চলতে চায়। তবে কবি পুরোপুরি কল্পনার জগতে না হেঁটে মাটির পথে, আলের পথে হাঁটতে চেয়েছেন। এরই মধ্যে দেশের সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। এই সবুজ সমৃদ্ধ ধানের মাঠ

ও মানুষের সমাজে যারা প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের রক্ষা করাই যেন কবির দায়। আর এই স্বপ্নপুরণের জন্য হেতালের লাঠিকে অবলম্বন করতে বলেছেন। তাই কবি বিশ শতকের আটের দশকে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও নিজস্ব আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলকে সক্রিয় হতে বলেছেন। তাই কবিতার শেষ চরণে কবির মুখে শোনা যায়—

> ''যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
> শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
> হেতালের লাঠি যেন এ কালপ্রহরে মনে রাখে
> চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে।''[৩৩]

কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সকলকে চাঁদ সদাগরের একাগ্রতা, বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তার সঙ্গে কল্পনা করেছেন, যারা এই মাটির সঙ্গে যুক্ত। কোন রকম ছলনা, মায়াজাল অর্থাৎ কালঘুম বা মায়াঘুম পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। এই চম্পনগরে আজ বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে তৈরি এক স্বার্থের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুবিধাবাদী লোকের চক্রান্তে মানুষের আদর্শ ও স্বপ্ন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ভোগবাদী এই সভ্যতায় কবি জাতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। মানুষের মনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চাঁদবেনেকে নিয়ে এসেছেন কবিতার মধ্যে। তার হেতালের লাঠিই হল কবির অস্ত্র। বিপন্ন এ সময়ের দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হেতালের লাঠিকেই কবি মাটির মানুষের বেঁচে থাকার হাতিয়ার করতে চান। এই দিক দিয়ে কবিতাটি হয়ে উঠেছে অভিনবত্বের এক নতুন দিক। মধ্যযুগের চাঁদ সদাগর চরিত্রের হেতালের লাঠিকেই কবি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। তাই সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা কবিতার কালান্তর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> ''চারের দশকে কোনো কোনো কবি লোকপুরাণ, জাতীয় মীথ ইত্যাদিকে কবিতায় ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। আমার বলতে দ্বিধা নেই সে কবিতায় যে ব্যঞ্জনা আভাসিত হতে গিয়েও পারেনি, 'হেতালের লাঠি' সে সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই কালরাত্রির উপরই তখন একটি কবিতা শারদীয় সংখ্যা 'পরিচয়'-এ বেরিয়েছিল। ... শঙ্খ 'হেতালের লাঠি'তে চাঁদবেনেকে নায়ক করে শুধু যে পটভূমির ব্যাপকতা এনেছেন তাই নয়— সমস্ত সংকটকে এক বিপুলতর ব্যাপ্তি দিয়েছেন। অধিকার নিয়েই বলছি— নিশীথনগরে কানীর চক্রান্ত নিয়ে লেখা এ কবিতা অনেক লক্ষ্যভেদী কবিতা—উৎকৃষ্টতর

কবিতা।”[৩৪]

চাঁদবেনে যেমন হেতালের লাঠি দিয়ে অশুভ শক্তির প্রতীক মনসার ঘট ভাঙে, মনসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কবি শঙ্খ ঘোষ বিশ শতকের উত্তাল পরিস্থিতিতে হেতালের লাঠিকে নিয়ে এসে মনসামঙ্গলের নবরূপায়ণ ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগরের হেতালের লাঠি হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগের হাতিয়ার। মনসা পুরাণের চাঁদবেনের হেতালের লাঠি মনসাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলেও কবি বিশ শতকে সচেতনভাবে এই হাতিয়ার ব্যবহার করতে বলেছেন। যা মাধ্যমে জয় নিশ্চিন্ত হয়। এইভাবে মনসামঙ্গলের মিথের নতুনভাবে আধুনিক রূপায়ণ ঘটেছে কবি শঙ্খ ঘোষের হাতে। এই দিক দিয়ে কবিতাটি সার্থকতা লাভ করেছে।

বরাক উপত্যকাকে সমস্ত বাংলা সাহিত্যের ভূবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বলা যায় তিনি হলেন **শক্তিপদ ব্রহ্মচারী** (১৯৩৭-২০০৫)। তিনি প্রকৃতির কবি, রোম্যান্টিক কবি। প্রেমের কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তবে রোম্যান্টিক কবি হয়েও তিনি বস্তুবাদী। সাধারণ মানুষ, জন্মভূমি মাটির কথা, স্বজন-পরিজনের কথা অত্যন্ত সচেতনভাবে উঠে এসেছে। তাঁর কবিতায় ছন্দের ব্যবহার যেমন উৎকৃষ্টতার দাবি রাখে, তেমনি দ্বিধাহীন চিত্তে বাস্তবজগতের চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের সাত, আট ও নয়ের দশকের বিপর্যস্ত জীবনের চিত্র তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। রোম্যান্টিক এই কবি বাস্তব জীবনের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে অনেক সময় পৌঁচেছেন আমাদের অতীত ঐতিহ্যের কাছে। এরকমই তাঁর ‘অনন্ত ভাসানে’ (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থের ‘**মনসামঙ্গল**’ কবিতাটি। তৎকালীন সময়ের পরিস্থিতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাগাধুনিক সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যের কাছে হাত বাড়িয়েছেন। এছাড়া তিনি ‘সময় শরীর হৃদয়’ (১৯৭০), এই পথে অন্তরা’ (১৯৭৬), ‘কাঠের নৌকা (১৯৯৪), ‘লঘু পদ্য’,‘দ্বন্দ্ব অহর্নিশ’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

বিশ শতকের আটের দশকের পটভূমিকায় মনসামঙ্গলের আবহের আড়ালে সমকালীন চিত্রকে তুলে ধরেছেন। জলা-জঙ্গলময় পূর্বাঞ্চলে সাপের আধিক্যের কারণে মনসা পূজার প্রচলন রয়েছে। নিম্নভূমি এই বরাক উপত্যকায় বর্ষণমুখর দিনে সাধারণ মাটির মানুষের জীবনযাপন অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আঠারোটি চরণে রচিত অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দোময় এই কবিতায় প্রথমেই কবির মুখে শোনা যায়—

‘‘সপ্তডিঙা মধুকর চারিদিকে জল

শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসা-মঙ্গল
পচা পাটে এঁদো ডোবা বিষধর ফণা
হু হু করা কালসন্ধ্যা ভেসে আসা গানে
সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।”[৩৫]

কবি ‘ছেঁড়া কাঁথা’ ও ‘পঁচা পাটের এঁদো ডোবা’র মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলেছেন। শ্রাবণের অবিশ্রাম ধারার ফলে চারিদিকে অথই জল। এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় ভেসে আসা গান সাইবেনের কন্যা বেহুলার গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যাওয়ার মতো। তবে এই বন্যা কবলিত এলাকায় কোন চম্পকনগর বা নিছনিনগর নেই। এখানকার মাটির ঘরে প্রদীপের অভাবে অন্ধকারে ‘নিরক্ষরা’ বুড়ি মা ছেলের জন্য পথ চেয়ে থাকে। ছেলে রাতের অন্ধকারে জাল নিয়ে নদীতে গেলে, দেবী মনসার কাছে এই বুড়িমা প্রার্থনা করে ছেলের মঙ্গলের জন্য। আসলে সাধারণ মানুষের করুণ জীবনচিত্র কবি জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতার শেষ ছয়টি চরণে মানুষের দারিদ্রতা ও আকূতির চিত্র উঠে এসেছে—

‘‘গাঙের গর্ভিনী সেই গন্ধ ভেসে আসে
শ্রাবণীর দিগম্বরা দখিনা বাতাসে
এখনো বুকের দ্বিজ বংশীদাস কহে
হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কালীদহে ...
ডহরের ঘোর লাগা গহনের টানে
সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।”[৩৬]

বিশ শতকের আটের দশকের মানুষের করুণ আর্তিকে মনসামঙ্গলের কালীদহের সেই হাহাকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বর্ষণমুখর এই দিনে মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের আবেগ ভেসে আসে। কিন্তু কঠিন বাস্তবের কবলে পড়ে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। বেহুলা যেমন মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে যায় তাকে জীবিত করার সংকল্প নিয়ে। বেহুলার এই করুণ পরিণতিতে কান্নায় ভেঙে পড়ে চম্পকনগর ও গাঙ্গুড়ের তীরের মানুষজন। আলোচ্য এই কবিতায় শ্রাবণের ধারার সঙ্গে মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন কবি। এই যন্ত্রণাকে কবি মিলিয়েছেন মনসামঙ্গলের সেই দুঃখ-আর্তির সঙ্গে। এইভাবে কবিতাটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ। ‘গাঙ’, ‘কালীদহ’, ‘সপ্তডিঙা-মধুকর’, ‘বিষধর ফণা’, ‘বেহুলা’, ‘সায়ের ঝিয়ারি’, ‘অনন্ত ভাসানে’, ‘নিছনি’, ‘চম্পক-নগর’, ‘লখা’, ‘মনসা’, ‘ডহর’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের ফলে মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গ ব্যবহার

করেছেন। কবিতায় মনসামঙ্গলের আবহ ব্যবহার করলেও বিশ শতকের হাহাকার, অসহায় মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই নবনির্মাণের দিক দিয়ে কবিতাটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

ক্রমানুসারে আলোচনার প্রেক্ষিতে এরপর আমরা পাই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি **উত্তম দাশের 'একালের মঙ্গলকাব্য'** (২০০৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কতকগুলি কবিতা। এই কাব্যের **১, ২, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৩** সংখ্যক কবিতায় কবি উত্তম দাশ মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন। কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা কবি সম্পর্কে দু'চার কথা বলার চেষ্টা করছি। সাহিত্যিক উত্তম দাশের কবিতার বই-এর মধ্যে পাই—

১. 'যখন গোধূলী' (১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ)

২. 'লৌকিক অলৌকিক' (১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

৩. 'জ্বালামুখে কবিতার' (১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

৪. 'রুণুকে' (১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ)

৫. 'এ জন্মের প্রত্যাহার চাই' (১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)

৬. 'ভারতবর্ষের একজন' (১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ)

৭. 'ভুল ভারতবর্ষ' (১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)

৮. 'Rhap sodies to Runu' (১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)

৯. 'নির্মাণে এসেছে' (১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ)

১০. 'রাত্রির স্থাপত্য' (১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ)

১১. 'ভ্রমণের দাগ' (১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)

১২. 'কাব্যনাট্য ও কবিতা' (১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)

১৩. 'এক ভারতীয় কবির ডায়েরি থেকে' (১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)

১৪. 'একালের মঙ্গলকাব্য' ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি।

এছাড়া প্রবন্ধগুলির মধ্যে হল—

১. 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)

২. 'বাংলা সাহিত্যে সনেট' (১ম খণ্ড, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ এবং ২য় খণ্ড ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)

৩. 'কবিতার সেতুবন্ধ' (১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

৪. 'বাংলা ছন্দের কুটস্থান' (১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)

৫. 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' (১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)

৬. 'বাংলা কাব্যনাট্য' (১ম খণ্ড, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ এবং ২য় খণ্ড, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ)

৭. 'বাংলা ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি' (১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ)

৮. 'ক্ষুধিত প্রজন্ম ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ)

আবার 'কবিতা : ষাটসত্তর' (১৯৮২খ্রীষ্টাব্দ), 'গল্প : ষাটসত্তর' (১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'আধুনিক প্রজন্মের কবিতা' (১৯৯১), 'আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা' (১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'শতাব্দীর বাংলা কবিতা' (২০০১) প্রভৃতি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

বহু সংখ্যক কবিতায় বই, প্রবন্ধ রচিত হওয়ার পরে আমরা তাঁর অন্যতম কবিতার বই 'একালের মঙ্গলকাব্য' পেয়ে থাকি। এই কাব্যের মধ্যে তিনি মধ্যযুগের সাহিত্যের মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং চৈতন্যজীবনী কাব্যের বিষয়বস্তুকে নিয়ে বর্তমান যুগের চিত্রকে তুলে ধরেছন। বাংলার নদী, মাঠ, ঘাট, ভাটফুল প্রভৃতি অনুষঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কবি বাঙালির ঐতিহ্যের দিকটিকেও তুলে ধরেছেন।

প্রথম কবিতাতে আমরা দেখতে পাই মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিক পুত্র লখীন্দরকে গাঙুরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে ঘরে ফিরে আসে, স্তব্ধ হয়ে পড়ে চম্পকনগর। উত্তম দাশের 'একালের মঙ্গলকাব্য' কাব্যের প্রথম কবিতাটিতে তেমনি চাঁদের পুত্র হারানোর শোক গোটা কবিতা জুড়ে ছেয়ে রয়েছে। কবিতায় আমরা পাই—

> ''তখনো ভোর হয়নি,
> চম্পকনগরের শোক এখন তন্দ্রার মধ্যে,
> সনকাকে চাঁদ হয়তো কিছু বলতে এসেছিলেন
> শোক তার মাধুর্য শেষ করেছে, ফেলে গেছে ঘুমের ক্লান্তি
> চাঁদ ফিরে এলেন, কেউ নেই দেখার
> তবু নিজেকে গোপন করতে করতে নদীর ঘাটে
> ফাঁকা, বেহুলা তখন গাঙুড়ের জলে চিহ্ন হয়ে গেছে।''[৩৭]

২২টি চরণের তিনটি স্তবক নিয়ে গঠিত গ্রন্থ কবিতার প্রথম স্তবকে সর্বহারা, নিঃস্ব মানুষের কথা তুলে ধরতে কবি আশ্রয় নিয়েছেন মধ্যযুগের অন্যতম ট্রাজিক চরিত্র চাঁদ সদাগরের। বিশ শতকের শেষাংশ বা একুশ শতকের প্রথমাংশেও মানুষ অশুভ শক্তির কবলে পড়ে নিজের সুখ-শান্তি হারিয়েছে। শোকে জর্জরিত মানুষ হারিয়েছে মাধুর্য। নিজের ক্লান্তিকে দূর করে মানুষ নতুনভাবে

স্বপ্ন দেখতে চায়। মানুষ মনসারূপী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে। যতক্ষণ প্রাণ রয়েছে এই অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত করবে না সে।

পতিব্রতা নারী বেহুলা স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য 'গাঙুরের জলে' ভেসে যায়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় চম্পকনগরের ঘাট থেকে। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে দেখি বেহুলা বাংলার নদী পথে ঘুরতে ঘুরতে স্বপ্ন দেখে সে গিয়ে পৌঁচেছে ইন্দ্রের সভায়। বেহুলার গায়ে ভাঁটফুলের গন্ধ ও দুই চোখে উদাস মাঠের ছবি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সময়ের নারীলোলুপ, স্বার্থান্বেষী পুরুষ মানুষের মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে এখানে। কবিতায় তাই ইন্দ্র চরিত্রের মুখে উঠে এসেছে—

''— চম্পকনগর, মনসা, চাঁদ সদাগর, স্বামী, প্রাণ,
এসব শব্দের কোন অর্থ নেই আমার কাছে, তোমার শরীরে
সুর আছে, প্রাণ তো তুমিই জাগাবে।''[৩৮]

একুশ শতকের প্রথমার্ধে এসেও আমাদের সমাজের নারীরা সুরক্ষিত না তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কবিতার শেষের দুই স্তবকে। আজও প্রলোভনের শিকার হতে হয় নারীকে। দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে অতীতকালের বেহুলাকে যেমন নিজের শরীরের অঞ্জলি দিতে হয়েছিল, আজকের বেহুলাকেও শরীরকে উৎসর্গ করতে হয় নিজের কার্যসিদ্ধি করতে গেলে। তাই বহুদিন নাচ ছেড়ে দিলেও বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে শরীরকেই সুর করে তুলতে হয়। এই সুরের মধ্য দিয়ে পুরুষের প্রাণ জাগে। অবহেলিত, জর্জরিত নারীর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কবি অবলম্বন করেছে মনসামঙ্গলের বেহুলা চরিত্রকে। কবিতার শেষের চরণগুলিতে বেহুলার এই করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

''বেহুলা কেঁপে উঠলো,
তিন হাজার বছর ঘুম হয়নি, এমন জড়ানো সুর—
লখিন্দর বললো, চোখে মুখে এত নুন ঢেলেছ কেন বেহুলা?''[৩৯]

এইভাবে বর্তমানের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে মনসা পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন কবি। আর এখানেই মনসামঙ্গলের নবরূপায়ণ ঘটেছে কবিতায়।

কাব্যের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতারও একই চিত্র ফুটে উঠেছে। কবিতার একই চিত্র ফুটে উঠেছে। কবিতার প্রথমেই মনসার মুখের কথায় প্রকাশ পেয়েছে দেবরাজ ইন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকটি। বর্তমান সমাজে কিছু কিছু মানুষ যেমন মেয়ে মানুষ দেখলে প্রলোভনের রিপু জেগে ওঠে তা ফুটে উঠেছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় চাঁদের পুত্রবধূ বেহুলার লাস্যনৃত্যের চিত্রের মধ্য দিয়ে।

বর্তমানে যে স্বর্গভূমি সেখানে সবাই মেতে উঠেছে গাজনের মেলার উৎসবে। গ্রামের মেয়ে বেহুলা অনেক নেচে মুখমণ্ডলে ঘাম ভর্তি করে, অনেক 'দিয়ে থুয়ে' জীবন হাতে বয়ে আনে। নারীর এই আচরণ সত্যিই অপমানের। মনসা চাঁদ বণিককে পূজার জন্য মিনতি করলে, সেই সঙ্গে আরো বলেন—

''তোমার ছেলের বউ বেশ সেয়ানা
নেচে কুঁদে মজিয়েছে বুড়োটাকে।''[৪০]

চাঁদ বাম হাতে দেবীকে পূজা নিবেদন করে, যা অশুভ শক্তির কাছে মানুষের পরাজয়। অন্যদিকে বেহুলা তার সাহসিকতা, সত্যতা ও একনিষ্ঠতার জোরে যে প্রাণ ফিরিয়ে আনে সেটাও যেন সত্যের জয় নয়। অমঙ্গলের এই পরিস্থিতিতে কেঁদে উঠে বাংলার নদী প্রান্তর। কবিতার শেষে দুই স্তবকে এই সত্যের পরাজয় চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

ক্রুদ্ধ চাঁদের মুখে মনসার যে পরিচয় পাই তার মধ্য দিয়ে অবহেলিত বঞ্চিত নারীর চিত্র উঠে এসেছে। কবিতার মধ্যে মনসা চাঁদের কথোপকথনে মনসার কথা উঠে এসেছে—

''মনসা ফস করে উঠলেন, কি চিনলি?
চাঁদ বললেন, অঃ শিবঠাকুরের সেই নষ্ট মেয়ে,
কোন দিন তোর স্বর্গে ঠাঁই হবে না
শুধু জঙ্গলে জঙ্গলে সাপখোপের মধ্যেই জীবন।''[৪১]

দেবসভা থেকে মনসা যে বিতাড়িত, নষ্ট মেয়ে হিসেবে সাধারণের কাছে পরিচিত। জঙ্গলে জঙ্গলে সাপখোপের মধ্যে যার বসবাস তার জীবন পরিচয় বর্তমানের সাধারণ নারীর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে উঠে এসেছে তা খুবই প্রশংসনীয়। মানুষের মধ্যে ভালোবাসার কথা, পৃথিবীর মমতার কথা, পাহাড়, নদী, গাছপালা, মাঠের ফসলের ঘ্রাণ, নগরের পথের ধূলোর বর্ণনা কবিতায় উঠে এসেছে। বেহুলার মতো একটি মেয়ের কাছ থেকে বেদনা ও ভালোবাসার সুর শোনা যায় মর্ত্যভূমি থেকে। সনকার সঙ্গে—

''কেঁদে উঠল বংলার নদী প্রান্তর
কাশবন খুব কেঁপে উঠল বারেবারে
বাঁশ বাগানের মাথায় যে চাঁদ উঠেছিল
টুপ করে ডুবে গেল অন্ধকারে।
দুটো কাঠবিড়ালি নামছিল শিউলির ডাল বেয়ে,

থমকে দাঁড়ালো, বললো— কি ব্যাপার—
মাঠবন নদীপ্রান্তর সবাই কাঁদছে
অথচ কারো চোখে জল নইে।”[৪২]

চাঁদ বণিক, মনসা, বেহুলা প্রভৃতি মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গগুলি নিয়ে এসে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। আধুনিক সংকটময় যুগের প্রেক্ষিতে কবি মনসা-কথার সার্থক নবরূপায়ণ ঘটেছে।

১৫ সংখ্যক কবিতায় চাঁদ স্বর্গের উদ্যানে পারিজাত গাছ থেকে ফুল তুলতে গিয়ে সর্পভূষিতা মনসাকে ল্যাংটো দেখেন। ফলস্বরূপ মনসা মর্ত্যে যাওয়ার অভিশাপ দেয় চাঁদের শরীরের ক্ষুধার জন্য। এই কবিতায় যুক্তি করে বেহুলাকে নিয়ে চম্পকনগরে সুখ-দুঃখের ঘর গড়ে তোলার মধ্যে আশাবাদের পরিচয় পাই। মানুষ সবকিছু হারিয়েও আবার নতুনভাবে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেন। মনসামঙ্গল কাব্যকে আশ্রয় করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আধুনিক জীবনের কথা উঠে এসেছে। যার ফলে কবিতাটির নবনির্মাণ হয়ে উঠেছে সার্থক।

কবি ১৬ সংখ্যক কবিতার মনসামঙ্গল কাব্যের নেতাঘাটের চিত্র তুলে ধরেছেন। মৃত স্বামীকে জীবিত করার যে আশা, বেহুলা নেতা ধোপনীকে দেখে তা পরিপূরণের প্রচেষ্টা চালায়। নেতা ছেলেকে আছড়ে মেরে ফেলে সারাদিন কাপড় কেঁচে সন্ধ্যার সময় জীবিত করে ঘরে ফিরে। এই দৃশ্য দেখে বেহুলা লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য মিনতি করে। পরে নেতা ধোপানীর সঙ্গে স্বর্গে গমন করে। বেহুলা স্বর্গে ইন্দ্র এবং অন্যান্য সবার মনোরঞ্জন করে লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। কবি বেহুলা নামক মিথের আড়ালে সাধারণ মেয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছেন। বেহুলার মতো সতীত্বময়ী নারী কাঁদলে যেন তারার সপ্তমে বেহাগ বাজে, যে ভঙ্গিতে তার শরীর কাঁপে, যেন সুর জাগছে। স্বেচ্ছাচার জগতের বাইরে যে সুন্দর শুভ্র জগৎ তার কথা উঠে এসেছে কবিতায়। কবিতার চতুর্থ স্তবকে তাই দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে তাই শোনা যায়—

‘‘ইন্দ্র বললেন, তুই পৃথিবীর মেয়ে
কলমিলতা আর ভাঁটফুল
এসব সৌন্দর্যের গন্ধ এখনো তো পাই না
সত্যি করে বল, পৃথিবীটা সত্যি এত সুন্দর?”[৪৩]

এইভাবে কবি আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও মঙ্গলময়ী নারীর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ঘটিয়েছেন মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ। বেহুলা এখানে জীবন শব্দের অর্থ হাতে বয়ে নিয়ে এসেছে।

১৮ সংখ্যক কবিতাতেও বেহুলার চম্পক নগরে ফিরে আসার দৃশ্য। সমস্ত চম্পক নগরের আশা-ভরসা হল এই বেহুলা। সে মনসাপূজা করার জন্য চাঁদকে অনুরোধ করে। চাঁদ শিবমন্ত্র উচ্চারণ করলেও মনসার সম্বল হয় এই বেহুলা। তাই চম্পক নগরের প্রার্থনা নিয়ে বেহুলা যখন নদীর ঘাটে ফিয়ে আসে, মনসা বেহুলাকে আশ্রয় করেই চাঁদের কাছে পূজা আদায় করে। মনসামঙ্গল কাব্যের ঘটনার মোড়কে কবি সংকটময় সময়ের এক বিধ্বস্ত নারীর চিত্র তুলে ধরেছেন।

''এখন চাঁদ বা মনসা নয়,
বেহুলা, মুখমণ্ডলে সমীর শুধু
হলুদ রঙটাই দিয়েছেন, আর হাতে
সূর্যকে ফালা ফালা করে তার একটা খণ্ডে
প্রতীকের মতো জীবন নামক এক অসহায় ভঙ্গি।''[৪৪]

উক্ত কবিতাটিতেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

কাব্যে ১৯ সংখ্যক কবিতায় দেখি মনসার এক অন্য মানসকিতার চিত্র পায়। চাঁদের বা হাতে ছোঁড়া ফুল মাথায় নিয়ে কেঁদে ফেললেন মনসা। ১৯টি চরণের ৬টি স্তবকের এই কবিতাটি অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবিতার প্রথমেই তাই উঠে এসেছে—

'শুধু বেহুলা, আর বেহুলা
আমরা যেন কেউ নই, চাঁদের বাঁ হাতে ছোঁড়া ফুল
মাথায় নিয়ে টসটস করে মানুষের চোখে কাঁদলেন মনসা।''[৪৫]

মনসা এখানে যেমন মানুষে পরিণত হয়েছেন, তেমনি সনকা, লখীন্দর, বেহুলা এমনকি শিব চরিত্রের মধ্যেও মানবায়ণ ঘটিয়েছেন। সনকা লখীন্দরের মুখে মুখ ঘসে মায়ের মতো কাঁদলেন। মনসার পূজা দিয়ে চাঁদ ধর্মত্যাগী হয়েছেন বলে নিজেকে অপরাধী মনে করেন। চাঁদের এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন বেহুলা। লৌকিক দেবতা মনসার পূজা দেওয়াকে তিনি স্বধর্মে ফিরে আসা বলেন। মানুষের ধর্মই হল এটি। শিব পূজারী সাহসী চাঁদ তবুও ভয় পেয়ে যায় শিবের কথা স্মরণ করে। বেহুলা তার শরীর থেকে দেবত্বভাব সরিয়ে মানুষের শরীরে শিবের সামনে সটান দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন— মহাদেব রাগ করেছেন নাকি? প্রত্যুত্তরে শিবের বক্তব্য—

''দূর বেটি, শিবের খুশি খুশি মুখ, গলায় বাৎসল্য,
মেয়ের একটা গতি হলো
চাঁদকে বলিস, আমার আশীর্বাদ রইল।''[৪৬]

গল্পের আকারে বর্তমান এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে। মানবিকতার জয় ঘোষিত হয়েছে। দাম্ভিকতা নয়, সহজ মনে যে দেবতাকে সত্যিকারের অঞ্জলি দেওয়া হয় তা এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। দেবী মনসা ও মহাদেব এখানে একাকার হয়ে উঠেছে। চাঁদ সদাগর ও বেহুলা মনসার পূজা করলেও মহাদের গলায় বাৎসল্যের সুর। আধুনিক সংকটময় যুগে মানবধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে। আর কবিতাটি হয়ে উঠেছে আধুনিক মঙ্গলকাব্য।

আবার কাব্যের ২০ সংখ্যক কবিতাটি আমরা একটু অন্যরকম পেয়ে থাকি। কবিতাটিতে স্বয়ং দেবী মনসা ও মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি নারায়ণ দেবের পারস্পরিক কথোপকথনে দ্বন্দ্ব মুখরিত হয়েছে। জীবনের কথা তুলে ধরতে শুধু বেহুলার কথা বলেছেন নারায়ণদেব। মনসামঙ্গলের অন্যতম চরিত্র সনকার কথা সেভাবে উঠে আসেনি। আসলে মানবজীবনের টানাপোড়েনের ক্ষেত্রে শুধু বেহুলাই উঠে এসেছে কবির লিখনে। কবিতায় তাই মনসার বক্তব্যে উঠে এসেছে—

> ‘‘জীবনের কথা বলতে গেলেই শুধু বেহুলা,
> বুঝি না কিছু, মঙ্গলগানের মধ্যে
> বেশ খিদে মিশিয়ে দিয়েছ তোমরা,
> আঠারো বছরের মেয়েটিকে দিয়ে নইলে কেউ
> নাচায় ও ভাবে? তাও আবার অতগুলো দেবতার সামনে?’’[৪৭]

কবি দেবতার থেকে মানুষকে বড় দেখাতে গিয়ে প্রতিবাদী নারী হিসেবে মনসাকে তুলে ধরেছেন। নিজেকে সে নির্দোষ মনে করে দেবতাদের দোষারোপ করে। নেহাতই চাঁদের পূজা পাবার তাড়া ছিল বলে বেহুলাকে ফিরিয়ে আনেন। কবি মনসামঙ্গলের বিষয়টিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেন। কবিতাটির শেষের স্তবকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পায় আমরা। চাঁদ সদাগর নাকি কবি নারায়ণদেবকে নির্দেশ দেন নতুন মঙ্গল গান রচনা করতে। পালার নাম দিতে বলেন ‘বেহুলামঙ্গল’। মঙ্গল কাব্যের নতুনতর নির্মাণ হিসেবে কবিতাটি সত্যিই প্রশংসনীয়।

মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে রচিত ২৩ সংখ্যক কবিতার প্রথমেই দেখতে পাই লখীন্দর বেহুলার একনিষ্ঠতায়, পাতিব্রত্যতার জোরে দেবসভায় প্রাণ ফিরিয়ে পায়। গ্রামের মেয়ে বেহুলাও অতগুলো দেবতার সামনে সাতদিন একটানা নৃত্য করে নিজেও হতভম্ব। লখীন্দরের স্মৃতিতে ভেসে আসে অতীতের ঘটনা। দ্বিতীয়, তৃতীয় স্তবকে বাসরঘরে কালনাগিনীর দংশনের কথা ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে শেকড়বাকড় ও জলের ঝাপটা দিয়ে প্রাণ ফিরে পাওয়ার কথা। লখীন্দর পুনরায় বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বেহুলার বুক কেঁপে ওঠে। শেষের স্তবকটিতে

বেহুলা-লখীন্দরের মিলনের রোম্যান্টিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষের যে কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়ার চিত্রটি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে—

''অনেকক্ষণ দিন হয়েছে, মেঘলা আকাশ,
সাগরের জলে জুঁইফুলের রঙ, বেহুলার
ভয়ের শরীর জাপটে ধরল লখিন্দর
গালে মুখ ঘষলো, ঠোঁটের লবণ থেকে
স্বাদ তুলে নিলে, দুই স্তনের মাঝে মুখ গুঁজে
মানুষের মতো কেঁদে ফেললো লখিন্দর।
জীবনে এই প্রথম পুরুষ মানুষ শব্দের ব্যবহার শিখল বেহুলা।''[৪৮]

২৪শে মে, ১৯৯৯ থেকে ২৯ শে সেপ্টেম্বর ২০০২, দীর্ঘ এই সময়ে লিখিত মোট ৫০টি কবিতা কবি উত্তম দাশ 'একালের মঙ্গলকাব্য' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আধুনিক যুগের মানুষের বিভিন্ন পরিস্থিতি, মনস্তাত্ত্বিক দিক ও সামাজিক দিকটি তুলে ধরতে কবি আশ্রয় নিয়েছেন সুদূর মঙ্গলকাব্যের। বিশেষ করে মনসামঙ্গলকে নিয়ে রচিত যে আটটি কবিতা, বাংলার প্রকৃতির চিত্র খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। মনসা, চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, সনকা চরিত্রগুলি বাংলার সাধারণ নরনারীতে পরিণত হয়েছে। এমনকি দেবাদিদেব মহাদেবের মধ্যেও বাৎসল্য রূপ ফুটে উঠেছে। এই কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের আধুনিক নবনির্মাণ। তাই সমালোচক সনৎকুমার নস্করের কথা যথার্থই বলা যায়—

''এই সব টুকরো লেখাগুলোতে উত্তমবাবু চমৎকার ভাবে ফেলে আসা সময়ের সঙ্গে নিকট বর্তমানকে গাঁটছাড়া বেঁধে দিয়েছেন। চাঁদ বণিকের গল্পের এক-একটা স্মরণীয় মুহূর্তকে বেছে নিয়ে আজকের সমাজ প্রেক্ষাপটে তাকে দাঁড় করিয়ে দুর্দান্ত সাহিত্য-কোলাজ সৃষ্টি করেছেন। এভাবে পুরনো চরিত্র আর ঘটনাকে নিয়ে সময়ের ছুরিতে ছেঁড়া-কাটা করা অতি সহজ ও ক্ষমতার অপেক্ষা রাখে। একই সঙ্গে, আগেকার লুপ্তপ্রায় বিষয়গুলি অধুনাতন প্রেক্ষিত পাওয়ায় সার্থক হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যের শিরোনামও।''[৪৯]

অবিভক্ত বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত কবি দীপঙ্কর মাহমুদ (১৯৫৬- ) মনসামঙ্গল কাব্যের মনসা, চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখীন্দর চরিত্রগুলি নিয়ে রচনা করেন 'বেহুলার ভেলা' কবিতাটি। বিশ শতকের আটের দশকে রচিত ১৫টি চরণের এই কবিতায় মনসামঙ্গলের কাহিনীকে আশ্রয়

করে এক গভীর ব্যঞ্জনা উঠে এসেছে। কবিতাটি রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা' (ফেব্রুয়ারী, ২০০৬) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

কবিতাটির প্রথম দুই চরণে চাঁদের দৃঢ় মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কালিদহের বাঁকে তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবে গেলেও মনসার পূজা সে কিছুতেই দিবে না। পরবর্তী চরণে রয়েছে লখীন্দরকে সাপে দংশনের ঘটনা। বেহুলা-লখীন্দর যখন নিদ্রারত অবস্থায়, ফুলের বাগান থেকে সাপ এসে দংশন করে লখীন্দরকে। ফুলের শয্যায় নীল লখাইকে দংশন করে বিষাক্ত কালসাপ। অন্যদিকে যে কালনিদ্রা বেহুলাকে জড়িয়েছে, শতচুম্বনেও এই ঘুম ভাঙবে না। আসলে কবি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সামাজিক পরিস্থিতি ও নারী চেতনা তা তুলে ধরতে চেয়েছেন। তৎকালীন মূল্যবোধহীনতা ও সংশয়ের যুগের চিত্র কবি তুলে ধরেছেন—

> ''বেহুলার ভেলা ভাসে গাঙুড়ের জলে,
> নদীতে লাশের গন্ধে শুশুকের বাড়ে আনাগোনা,
> ভাসে কুমিরের লেজা বেহুলা-বেহুলা,
> ভয়ানক সে কুমিরে তোমাকেও ধরে নিয়ে যাবে কোন অন্ধকারপুর!
> ঘরে ফিরে চলো বধূ, গাঙুড়ের জলে তুমি মুছে ফেলো সিঁথির সিঁদূর।"[৫০]

বাস্তববাদী এই কবি সমাজের স্বার্থান্বেষী, বিবেকহীন মানুষের চিত্র তুলে ধরেছেন। শুশুক ও কুমির যেন অশুভ মানুষের প্রতীক। গাঙুড়ের জলে ভেলায় বেহুলাকে ভাসতে দেখে তাই কবির ভয়, যদি কোন কুমির নিষ্পাপ এই নববধূকে কোন অন্ধকারপুরে টেনে নিয়ে যায়। সিঁথির সিঁদূর গাঙুড়ের জলে মুছে ফেলে ঘরে ফেরার কথা বলেন। আধুনিক জীবন দৃষ্টিতে কবি আসলে আজকের যুগের বেহুলাকে সতর্ক করেছেন। কারণ আজকে সেই চাঁদ সদাগর নেই, কিন্তু মনসার ফণা সর্বত্র দোলে। বেহুলার ভেলা পচে যায় কালো নোনা জলে। সমকালের যে বিপন্নতা, অন্ধকারময়তা তা কবি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন এই কবিতায়। তাই কবিতাটিতে তৎকালীন জীবনের চিত্র সাংকেতিকময় ভাবে উঠে এসেছে এবং মনসামঙ্গল কাব্য নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে সর্তকভাবে।

ক্রমানুসারে দেখতে গেলে মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিকের অনুষঙ্গ ও মনসার আক্ষেপকে নিয়ে রচনা করেন এ যুগের অন্যতম জনপ্রিয় ও শক্তিশালী কবি **জয় গোস্বামী** (১৯৫৪- ) **'ডিঙা'** নামক কবিতাটি। কবিতাটি আলোচনা করার পূর্বে আমাদের কবি সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। কবি জয় গোস্বামীর প্রথম কবিতা হিসেবে আমরা পাই 'সিলিং ফ্যান' নামক কবিতাটি। তার প্রথম রচিত

কবিতাগুলি 'সীমান্তে সাহিত্য', 'পদক্ষেপ' ও 'হোম শিখা' নামক লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬-এ দেশ পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর থেকেই বাংলা কাব্যজগতে তার বৃহত্তর পদার্পণ শুরু হয়। কবিতার মধ্য দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাই গুজরাটের দাঙ্গার পরে তার প্রতিবাদ, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবি জয় গোস্বামীর কবিতায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল—

১. 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' (১৯৭৭ খ্রী:)

২. 'প্রত্ন জীব' (১৯৭৮ খ্রী:)

৩. 'আলেয়া হ্রদ' (১৯৮১ খ্রী:)

৪. 'উন্মাদের পাঠক্রম' (১৯৮৬ খ্রী:)

৫. 'ভুতুম ভগবান' (১৯৮৮ খ্রী:)

৬. 'ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?' (১৯৮৯ খ্রী:)

৭. 'আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো' (১৯৯১ খ্রী:)

৮. 'গোল্লা' (১৯৯১ খ্রী:)

৯. 'পাগলী, তোমার সঙ্গে' (১৯৯৪ খ্রী:)

১০. 'বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা' (১৯৯৫ খ্রী:)

১১. 'পাতার পোশাক' (১৯৯৭ খ্রী:)

১২. 'মা নিষাদ' (১৯৯৯ খ্রী:)

১৩. 'জগৎবাড়ি' (২০০০ খ্রী:)

১৪. 'মৌতা ও মহেশ্বর' (২০০৫ খ্রী:)

১৫. 'শাসকের প্রতি' (২০০৭ খ্রী:)

১৬. 'দু-দণ্ড ফোয়ারামাত্র' (২০১১ খ্রী:)

১৭. 'একান্নবর্তী' (২০১২ খ্রী:)

১৮. 'বিষ' (২০১৩ খ্রী:) প্রভৃতি।

দু'টি স্তবকের চৌদ্দটি চরণের সনেট জাতীয় এই কবিতার প্রথম স্তবকে মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র চাঁদ সদাগরের প্রশস্তি রচিত হয়েছে। মেঘে ভরা ক্রুদ্ধ গাঙে চৌদ্দো ডিঙা ডুবে গেলে চাঁদ মাঝে মাঝে ভেসে উঠেছে নিঃশ্বাস নেবার জন্য। বলিষ্ঠ চিন্তাধারার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চাঁদ

জানে সামনে বড়ো খাদ প্রস্তুত, তবুও মনসার ফেলে দেওয়া কাঠ সে ধরবে না। স্ত্রীর সিঁথির সিঁদূর মুছে গেলেও, হাতের শাঁখা ভেঙে গেলেও মনসার দয়া সে কিছুতেই নেবে না। তীব্র লাঠির দাপটে ভেঙে চুরমার করে দেবে মনসার শরীর, বিগ্রহ, এমনকি দেবীর ঘটও। বরং এই চাঁদ সদাগর জল ঠেলে, পাশ কাটাবে ডুবন্ত পাথরকে। কবির ভাষায় ফুটে উঠেছে বিষয়টি এইভাবে—

''যদি তাতে আছড়ে পড়ে ভাঙে
তার সধবার শাঁখা, তবুও চেংমুড়ী কানি, তোর
দয়া সে নেবে না; তোর শরীর, বিগ্রহ কিংবা ঘট
যা পাবে চুরমার করবে তার তীব্র লাঠির দাপট;
বরং সে ঠেলবে জল, পাশ কাটাবে ডুবন্ত পাথর ...'' [৫১]

বিশ শতকের শেষের সীমানায় বিধ্বস্ত সময়ে দাঁড়িয়ে কবি এমন এক চরিত্রের কল্পনা করেছেন যিনি যুগের কাণ্ডারী হয়ে উঠবেন। প্রবল শক্তির জোরে সে বিনাশ করবে অশুভ শক্তিকে। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে মনসার বক্তব্য দেখা যায়। একদিন নাকি চাঁদ সদাগর ভুল করে মনসার কুঞ্জে ঢুকে পড়েছিল। তার হাতের 'হেন্তালের লাঠি' দেখেই পালিয়ে যায়। বিবস্ত্র হয়ে পড়ে মনসা। অসহায় এক নারীর অন্তরের দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে কবিতার এই পর্বের মধ্য দিয়ে। মনসার মুখে তাই শোনা যায় হতাশার সুর—

''এক চক্ষু কন্যা আমি, দিনে দিনে হয়েছি ডাগর।
ফিরেও দ্যাখেনি কেউ। তুমি কেন বুঝলে না তখন
সময়ে পূজা না পেলে দেহে লক্ষ ডিঙা ডুবে যায়।''[৫২]

কবি জয় গোস্বামী আধুনিক যুগ-যন্ত্রণা তুলে ধরতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মধ্যযুগের সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যে। এই সূত্রে কবিতাটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের সার্থক নবনির্মাণ।

সকমালীন বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম একজন বিশিষ্ট কবি হলেন **কৃষ্ণা বসু** (১৯৪৭-)। তিনি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ বণিকের ডিঙাকে অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতা রচনা করেন **'চাঁদ বণিকের ডিঙা'**। কবিতাটিতে আলোচনা করার পূর্বে কবি সম্পর্কে কিছু কথা বলা যায়। আবহমানকাল ধরে চলে আসা পুরুষতান্ত্রীকতার তিনি ঘোর বিরোধী। যাপিত জীবন তাকে যেভাবে অভিঘাত করেছে, তার সবকিছু উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। আজও তিনি লিখে চলেছেন তাঁর সুদৃঢ় লেখনী দ্বারা। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আমরা

পাই—

১. ‘শব্দের শরীর’ (১৯৭৬ খ্রী:)

২. ‘জলের সারল্যে’ (১৯৮২খ্রী:)

৩. ‘কর্ডিগানে কুসুম প্রস্তাব’ (১৯৭৬ খ্রী:)

৪. ‘নার্সিসাস ফুটে আছে একা’ (১৯৮৮ খ্রী:)

৫. ‘ও গান জাও, নাও ভাসাও’

৬. ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’

৭. ‘কবিতা সমগ্র’

‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ কবিতাটি কবি কৃষ্ণা বসু নাট্যকার শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকের অনুসরণে নামকরণ করেন। তবে তিনি পালাগানের থেকে বণিকের ডিঙাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে দেখি ‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ মনসাদেবীর চক্রন্তে ডুবে যায় সমুদ্রের অথই জলে। আলোচ্য কবিতায় বণিকের ডিঙার মুখে সমস্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কবিতার প্রথমেই তাই দেখা যায়—

> ‘‘আমি চাঁদ বণিকের ডিঙা,
> নদীর নির্জনে ডুবে আছি বহুদিন!
> সারা গায়ে শ্যাওলা ধরেছে।
> চুপ করে পড়ে থাকি ঠাণ্ডা কালো জলের গভীরে।’’[৫৩]

আমাদের অতীতের যে ঐতিহ্যপূর্ণ চরিত্র চাঁদ সদাগরের ডিঙা যেন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে নিমজ্জিত এই ডিঙার মুখে যে আক্ষেপ, যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে তা যেন বিশ শতকের আটের দশকের অন্ধকার জগতে নিমজ্জিত সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা। এই ডিঙাতে মাছেরা ঠোক্কর দেয়, ডিম পাড়ে, ছানাপোনা নিয়ে ঘর বাঁধে। গলে-পচে গেলেও তবুও দূর থেকে যখন ঢাকের গর্জন শোনে, তার শরতের ‘হিরণ রোদ্দুরে’ ইচ্ছে হয় ভেসে উঠতে। সাদা গরিমায় পাল তুলে ভেসে যেতে চায় ব্রহ্মদেশ, জম্বুদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার বন্দরে বন্দরে স্বর্ণের ভাণ্ড, তিসি মোম, লাক্ষারস, মধু, রেশম বস্ত্রের বিভা, দারুচিনি, কর্পূরের ভাড় ও মাঝি মাল্লাদের নিয়ে। কবির ইতিহাস চেতনার পরিচয় রয়েছে এই কবিতার মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগের বণিক সমাজের যে বৈদেশিক বাণিজ্যযাত্রা তার পরিচয় পাই এই কবিতায়। চাঁদ বণিকের জেদী কণ্ঠস্বর যেমনভাবে ভেসে চলে ডিঙার উপর দিয়ে। আজকে ডিঙাটি তেমনি ভেসে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে বিধ্বস্ত পরাজিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা

প্রতিফিলিত হয়েছে। কবিতাটির মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তিকে পেছনে ফেলে সত্যের জয় ঘোষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখা হয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রাম বাংলার গান, বাংলার পূজোর ঢাকের উৎসব— সবই নির্জনে ডুবে থেকে টের পাই এই ডিঙা। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষ অত্যাচারিতের কবলে পড়ে প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে। কবিতার শেষ দুটি  চরণে তাই উঠে এসেছে—

''কতদিন ডুবে আছি চাঁদ বণিকের ডিঙাখানি,
হায়, উড়তে ভাসতে ভুলে গেছি!''[৫৪]

কবি এই কবিতায় প্রতীকীভাবে বর্তমানের আশা, স্বপ্না, ভবিষ্যৎ ও সমৃদ্ধ জীবনের ঐতিহ্য ডিঙার রূপকে প্রতিফলিত হয় যায় মনসার চক্রান্তে উড়তে ভাসতে ভুলে গেছে। চারিদিকে উগ্র ভোগবাদী জীবনের বোধ, এসময় চাঁদ বণিকের ডিঙা প্রয়োজন যার মাধ্যমে বোঝাই করে আসবে সমৃদ্ধি।

মনসামঙ্গল কাব্যকে অনুসরণ করে 'মনসা জীবন মানবী জীবন' ও 'আবহমানের মান্দাস কবিতা দুটিও রচনা করেন। 'মনসা জীবন মানবী জীবন' কবিতাটিতে দেবী মনসার জবানিতে নারীর অপমান, তুচ্ছতা, অসহায়তা, বিরহ, যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। নারীর এই অবহেলিত জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে এইভাবে—

''দেবতার মেয়ে তবু সম্মান পাইনি,
আজীবন মার খেয়ে, মার খেয়ে খেয়ে,
অবশেষে বিষে ভরে সঞ্চয়ের থলি।
অন্ধ নই, কানা আমি, পূর্ণ দৃষ্টি নেই,
পাঠশালে গুরুমশায়ের কাছে, হায়,
কখনো দেয়নি কেউ যত্নে ভর্তি করে।''[৫৫]

বঞ্চিত হতে হতে নারীর যে হিংস্র রূপে পরিণত হতে পারে তা কবি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন এখানে। নারী দেবতা বলে শিবভক্ত চাঁদ সদাগর মনসার পূজা দেয়নি, বরং লাথি মেরে মনসার ঘট ভেঙে দেয়। সনকা-বেহুলা গোপনে দেবীর পূজা দিলে চাঁদ তা বিনষ্ট করে। বর্তমান যুগেও নারীকে হেলাফেলা করা হয় অনেক সময়। পুরুষ সভ্যতার প্রতি নারীর তীব্র ধীক্কার ও যন্ত্রণার বিষবাণ ধ্বনিত হয়েছে এই কবিতায়। কবির মুখে তাই উঠে এসেছে—

''বিষে ভরা ফণা তুলে হিস্ হিস্ দুলি।
তীব্র বিষ ছোবলের সামনে দাঁড়িয়ে
বাম হস্তে পূজা দেয়া পুরুষ সভ্যতা!''[৫৬]

বর্তমানের লাঞ্ছনা, অবজ্ঞা ও অসহায়তার যে চিত্র কবি তুলে ধরেছেন তার ফলে কবিতাটি সত্যি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ।

'আবহমানের মান্দাস' কবিতাটি মনসামঙ্গলের বেহুলার কলার মান্দাসে করে মৃত স্বামী লখীন্দরকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার ঘটনাকে নিয়ে রচিত। স্বামীকে নিয়ে বেহুলার যাত্রা যেন প্রতিবাদের যাত্রা। পুরুষ লখীন্দরের শব দেহ এখানে আবহমান কালের পুরুষের প্রাণহীন, হৃদয়হীন, ভালোবাসায় যেন পরিণত হয়েছে। তাতে বেহুলার প্রাণ ফেরানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এ আসলে নারীর একপ্রকার ঘৃণা ও লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ। ছয়টি স্তবকের মোট একশো সাইত্রিশটি চরণের বৃহত্তর এই কবিতায় নারীর হৃদয়-ভাবনার প্রতিকূল-পুরুষজাতির কাছে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার একপ্রকারের জীবনযুদ্ধ। এই যুদ্ধ দীর্ঘকালের। প্রাচীনকালের বেহুলা থেকে আজকের নারীও সেই পথের যাত্রী। কবিতার শেষের স্তবকে তাই কবি বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> ''আকাশ, ওরে আকাশ, অসীম নীল আকাশ ওরে,
> বাতাস ওরে গভীর বাতাস, অনন্ত কাল ধরে
> এই কাহিনী ছড়িয়ে দিস দেশ আর দেশান্তরে
> হায় রে প্রেমের জন্য কী প্রতিজ্ঞা মেয়ের অন্তরে
> জন্ম নিয়ে শেষে ভেলা ভাসায় কালের পারাপারে,
> ধারণ করো গহন সাগর আপন জলাধারে।''[৫৭]

কবি কৃষ্ণা বসু শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকাতে বলেছেন যে, সুদীর্ঘ দিন ধরে আমাদের সমাজে নারীর প্রতি সব রকমের লাঞ্ছনা-অপমান, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার যত রকমের ভুল, মেয়েদের উপর নিষ্ঠুরতা দমন-পীড়ন তার যে রক্ত ক্ষত দাহ টের পান, শব্দের মধ্যে দিয়ে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তার কবিতার মধ্য দিয়ে অবহেলিত নারীর আত্মকথা, নারী জাগরণের কথা উঠে আসবে সেটাই স্বাভাবিক। মনসামঙ্গলের বিষয়কে নিয়ে রচিত অথচ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির এই কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে এক একটি নবনির্মাণ।

উপরিউক্ত কবিতাগুলি আলোচনার পরেও আমরা মনসাপুরাণকে নিয়ে আরো কতকগুলি কবিতা পেয়ে থাকি যেগুলি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনতর হয়ে উঠেছে। সেগুলি হল—

১. কালিদাস রায়ের 'বেহুলা' কবিতা।

২. ভোলানাথ সাহার 'বেহুলার ভাসান যাত্রা' কাব্য।

৩. গীতা চট্টোপাধ্যায়ের 'মনসার সর্পসজ্জা' কবিতা।

৪. সুতপা সেনগুপ্তের 'বেহুলার, বেহুলার মাতার ও বেহুলার কন্যার বারমাস্যা' কবিতা।

৫. শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বেহুলার প্রতি অর্ফিয়ুস' কবিতা।

৬. অমিতাভ চৌধুরীর 'কেন্দুলি' কবিতা।

৭. সব্যসাচী দেবের 'বেহুলার ভাসান' কবিতা।

৮. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' কাব্যের 'বেহুলা' কবিতা প্রভৃতি।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কবিতা ও একুশ শতকের প্রথম দশকের বাংলা কবিতা মঙ্গলকাব্যের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। আর প্রত্যেকটি রচনাই হয়ে উঠেছে এক একটি সার্থক নবনির্মাণ।

বর্তমান অধ্যায়ের কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পাই মনসামঙ্গল কাব্যের 'চাঁদ সদাগর' বেহুলা, লখীন্দর, সনকা প্রভৃতি চরিত্রগুলি এবং চম্পকনগর, চাঁদ বণিকের ডিঙা প্রভৃতি বিষয়গুলির কবিতায় এমনভাবে প্রয়োগ ঘটেছে যে, আমরা যেন ফিরে গেছি সেই সুদূর অতীতে। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে নিয়ে এসেছেন মনসামঙ্গলের অন্যতম চরিত্র চাঁদ সদাগরকে। আবার আত্মসংকট, আদর্শহীনতা, নীতিহীনতা ও নারী অবমাননার সময়ে বেহুলা, লখীন্দর, সনকার আহ্বান যেন যুগের কাণ্ডারী করে তুলেছে চরিত্রকে। এইভাবে বর্তমান ও অতীতের মেলবন্ধনে কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে অনন্য সাধারণ। আর এখানেই হয়েছে আধুনিক কবির সার্থকতা। অত্যন্ত সুচারু দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসাকথার মিথকে আধুনিক কাব্য-কবিতায় প্রয়োগ করে ঘটিয়েছেন তার নবনির্মাণ।

**তথ্যসূত্র:**

১. সহায়ক পাঠ, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৮৫

২. তদেব, পৃ. ১৮৬

৩. তদেব, পৃ. ১৮৬

৪. সনৎকুমার নস্কর : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৫.০৮.২০১২, পৃ. ২০৫

৫. অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ৯০

৬. জীবননানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭১, প্রথম প্রকাশ মে,১৯৫৪, ভারবি দ্বাদশ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ৩৯।

৭. তদেব, পৃ. ৪০।

৮. তদেব, পৃ. ৪০

৯. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, জুলাই ২০০২, পৃ. ১৬৮

১০. তদেব, পৃ. ১৬৮

১১. বিপ্লব চক্রবর্তী : লোকাভরণ, আধুনিক কবিতা শৈলী, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৬, পৃ. ১০১

১২. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ: এপ্রিল ২০১২, দ্বিতীয় সংস্করণ ভূমিকা।

১৩. তদেব, পৃ. ৩০

১৪. তদেব, পৃ. ৩১

১৫. তদেব, পৃ. ৩১

১৬. তদেব, পৃ. ৩১

১৭. বীরেন্দ্র সমগ্র ১ম খণ্ড, সব্যসাচী দেব সম্পাদিত, অনুষ্টুপ, ২ই নবীনকুণ্ডু লেন, পরিবর্ধিত সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃ. ১৪৮

১৮. তদেব, পৃ. ১৪৮

১৯. বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, সপ্তম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ, ১৪১৩, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৩৬

২০. তদেব, পৃ. ১৩৭

২১. তদেব,পৃ. ১৩৭

২২. জিয়া হায়দার : শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েষ্ট ব্রেঞ্জ, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭, পৃ. ৩৫

২৩. তদেব, পৃ. ৩৫

২৪. তদেব, পৃ. ৩৯

২৫. তদেব, পৃ. ৪১

২৬. তদেব, পৃ. ৪৪

২৭. সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ১৭৬

২৮. তদেব, পৃ. ১৭৬-১৭৭

২৯. অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: নববর্ষ ১৪০৬, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ২০৬

৩০. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য : 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাকপ্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২, পৃ. ১৭৩

৩১. শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্দশ সংস্করণ, মাঘ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২৬

৩২. তদেব, পৃ. ১২৫-১২৬

৩৩. তদেব, পৃ. ১২৬

৩৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কবিতার কালান্তর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৪০৭ আশ্বিন, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ২৪২-২৪৩

৩৫. শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রমা প্রকাশনা, ৫ ওয়েস্ট ব্রেঞ্চ, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৪৪।

৩৬. তদেব, পৃ. ৪৫

৩৭. উত্তম দাশ, 'একালের মঙ্গল কাব্য', মহাদিগন্ত, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা১৪৪, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃ. ৯

৩৮. তদেব, প. ৯

৩৯. তদেব, পৃ. ৯

৪০. তদেব, পৃ. ১০

৪১. তদেব, পৃ. ২৭

৪২. তদেব, পৃ. ২০-২১

৪৩. তদেব, পৃ. ২৯

৪৪. তদেব, পৃ. ৩১

৪৫. তদেব, পৃ. ৩১

৪৬. তদেব, পৃ. ৩২

৪৭. তদেব, পৃ. ৩৩

৪৮. তদেব, পৃ. ৩৭

৪৯. সনৎকুমার নস্কর : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, দিশা পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২০১২, পৃ. ২১৩

৫০. রফিকউল্লাহ খান (সম্পাদনা) : বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা, একুশে পাবলিকেশন, প্রকাশ-২০০৫, পৃ. ২১৬

৫১. জয় গোস্বামী : শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রতিভাস, ১৮ এ গোবিন্দ মঙ্গল রোড, কলকাতা, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ-২০১৪, পৃ. ২৩১

৫২. তদেব, পৃ. ২৩১

৫৩. কৃষ্ণা বসু : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০৩, পৃ. ৩৩-৩৪

৫৪. তদেব, পৃ. ৩৪

৫৫. তদেব, পৃ. ১২১

৫৬. তদেব, পৃ. ১২২

৫৭. তদেব, পৃ. ১২২

*****